টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে
বাংলাদেশ প্রতিনিধিগণের জন্য প্রণীত

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সেপ্টেম্বর ২০১৯

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে
বাংলাদেশ প্রতিনিধিগণের জন্য প্রণীত

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সেপ্টেম্বর ২০১৯

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ
জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিগণের জন্য প্রণীত (ইংরেজি থেকে অনুদিত)

এসডিজি বিষয়ক প্রকাশনা ক্রমিক-১৯

প্রণয়নেঃ
ড. শামসুল আলম, সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

প্রণয়ন সহযোগী :
মো: মাহবুবুল হক পাটওয়ারী, যুগ্ম প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
জান্নাত-উল-ফেরদৌস, উপ-প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
মো: মাহবুবুল আলম সিদ্দিকী, সিনিয়র সহকারী প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
শিমুল সেন, সিনিয়র সহকারী প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
মৌসুমী খানম, সিনিয়র সহকারী প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
জারিয়াব হোসেন, সিনিয়র সহকারী প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ
সাদিয়া আফরোজ, সিনিয়র সহকারী প্রধান, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ

গ্রন্থস্বত্বঃ সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)
বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

“Engaging with Institutions” শীর্ষক IP প্রকল্প, ইউএনডিপি-বাংলাদেশ এর আর্থিক সহায়তায় মুদ্রিত।

সংখ্যা : ১৫০০

মুদ্রণ :
ইনতেশার প্রিন্টার্স
২১৭/এ, ফকিরাপুল, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা

“জনগণের ঐক্যবদ্ধ ও সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমেই
আমরা আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছাতে সক্ষম হতে পারি,
গড়ে তুলতে পারি উন্নততর ভবিষ্যৎ”

জাতির পিতা

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৭৪ সালের জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে)

“আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি
যেভাবে বাংলাদেশ এমডিজি অর্জন করেছে
ঠিক সেভাবে এসডিজি অর্জনে
বাংলাদেশ সক্ষমতা দেখাবে”

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

অনুক্রম

মুখবন্ধ		৮
অংশ ক	এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি	৯
এসডিজি ১	সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান	৯
এসডিজি ২	ক্ষুধার অবসান, খাদ্য নিরাপত্তা ও উন্নত পুষ্টিমান অর্জন এবং টেকসই কৃষির প্রসার	১৩
এসডিজি ৩	সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ	১৭
এসডিজি ৪	সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি	২৩
এসডিজি ৫	জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন	২৭
এসডিজি ৬	সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা	৩১
এসডিজি ৭	সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা	৩৩
এসডিজি ৮	সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন	৩৭
এসডিজি ৯	অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ	৪৩
এসডিজি ১০	অন্তঃ ও আন্তদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা	৪৭
এসডিজি ১১	অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা	৫১
এসডিজি ১২	পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনধরন নিশ্চিত করা	৫৩
এসডিজি ১৩	জলবায়ু পরিবর্তন ও এর প্রভাব মোকাবেলায় জরুরি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ	৫৫
এসডিজি ১৪	টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার	৫৯
এসডিজি ১৫	স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ	৬১

এসডিজি ১৬	টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ	৬৩
এসডিজি ১৭	টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা	৬৯
অংশ খ	অংশ খ: দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এসডিজি'র কাঠামোর আলোকে	৭৫
অংশ গ	অংশ গ : টেকসই উন্নয়নের জন্য টেকসই অর্থায়ন	৮৫
	২০১৬ থেকে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক এসডিজি সংক্রান্ত প্রকাশনা	৮৮

মুখবন্ধ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) বাস্তবায়নের পথে বাংলাদেশের সর্বশেষ অর্জনসমূহ সংক্ষিপ্তাকারে তুলে ধরার জন্য এই পুস্তিকাটি প্রণীত হয়েছে।

বাংলাদেশ ইতোমধ্যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করেছে, কিছু সূচকের অগ্রগতি ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সঠিক পথে রয়েছে। আবার কিছুসংখ্যক সূচকের অগ্রগতি কাঙ্খিতমাত্রায় আনয়নের দিকে বিশেষ নজর দিতে হবে। এসডিজির ২৩২টি সূচকের মধ্যে দেশে এ যাবৎ প্রাপ্ত ৮৩টি সূচকের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে এই পুস্তিকাটি প্রণয়ন করা হয়েছে। তবে এসডিজি বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে, বিশেষ করে অভীষ্ট ১১, ১২, ১৩, ১৪ এবং ১৫ এর সূচকগুলোর অগ্রগতি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে উপাত্তের অভাব এখনো একটি বিরাট চ্যালেঞ্জ।'সমাজের সবাইকে নিয়ে' এগিয়ে যাওয়ার টেকসই উন্নয়ন দর্শনকে ধারণ করে বাংলাদেশ সরকার এসডিজি'র প্রতিটি অভীষ্ট বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট পথনির্দেশনা প্রদানের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আমি প্রত্যাশা করি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে যোগদানকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের জন্য এই দলিলটি সহায়ক হবে, বাংলাদেশের এসডিজি অর্জনে অগ্রগতি বিষয়ে দেবে সম্যক ধারণা। এসডিজি'র এজেন্ডাসমূহ সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থায়ন পর্যালোচনার পাশাপাশি এ যাবৎ প্রাপ্ত বৈদেশিক সহায়তার পরিমাণও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

ড. শামসুল আলম
সম্পাদক

অংশ ক : এসডিজি বাস্তবায়নে বাংলাদেশের অগ্রগতি

এসডিজি ১: সর্বত্র সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান

প্রতিদিন ১.৯০ ডলারের নীচে বা জাতীয় দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে পরিমাপকৃত চরম দারিদ্র্য নিরসনে বাংলাদেশের অগ্রগতি কাঙ্খিত পর্যায়ে রয়েছে (অন ট্র্যাক)। তেমনি সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃতি এবং সরকারি মোট ব্যয়ের তুলনায় স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সামাজিক সুরক্ষা প্রভৃতি সেবা খাতে ব্যয় যথাযথ রয়েছে। উচ্চ দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে হিসাব করা দারিদ্র্য হ্রাসের অগ্রগতি কাঙ্খিত পর্যায়ে নেই বলে প্রতীয়মান হয়। তবে, সাম্প্রতিক উন্নয়ন অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আশা করা যায় যে প্রত্যাশিত ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করা গেলে এবং বর্ধনশীল আয়- বৈষম্য দারিদ্র্য হ্রাসে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির প্রভাবকে কোনোভাবে বাধাগ্রস্ত না করলে ২০২০ সালের মাইলফলক অর্জন করা সম্ভব। সার্বিক দারিদ্র্য চিত্রে মাথাগণনা সূচকে দারিদ্র্যের প্রকোপ ২০১৮ সালে দাঁড়িয়েছে ২১.৬ শতাংশে।

বহুমাত্রিক দারিদ্র্য নিরসনে ইতোমধ্যে সরকার বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে আছে ত্বরান্বিত, অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং অভিঘাতসহনীয় প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা, সামাজিক সুরক্ষার বিস্তৃতি ও কার্যকারিতা বাড়ানো, জেন্ডার সমতা বিধান, ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির প্রসার, ব্যপ্তি ও বহুমুখীতা প্রদান, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি আনয়ন এবং স্থিতিশীল সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি। বাংলাদেশ এসডিজি ১ অর্জনের চেষ্টা অব্যহত রাখবে, যার মধ্যে প্রাধান্য পাবে কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সামাজিক সুরক্ষা, মানবপুষ্টি উন্নয়ন, ব্যক্তিখাতে বিনিয়োগ পরিবেশ উন্নতিকরণ এবং বিভিন্ন অভিঘাত হ্রাস করা।

১.১ এসডিজি-১ এ বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন

১.১.১: আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত

১৯৯১-৯২ থেকে দারিদ্র্য হ্রাসে বাংলাদেশের চমকপ্রদ অর্জন ইতোমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০১০ এবং ২০১৬ সালের মধ্যে দারিদ্র্যের প্রকোপ হ্রাস পেয়েছে বার্ষিক গড়পড়তা ০.৮০ পয়েন্ট হারে।

সারণি ১.১ আন্তর্জাতিক দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত (%) (চরম দারিদ্র্য)

দারিদ্র্য পরিমাপ	১৯৯১	১৯৯৫	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬
১.৯০ ডলার জন প্রতি	৪৪.২	৩৫.৭	৩৪.৮	২৫.৭	১৯.৬	১৪.৮

উৎস: বিশ্ব ব্যাংক, বিশ্ব উন্নয়ন সূচক

১.২.১ জাতীয় দারিদ্র্য রেখার নিচে বসবাসকারী জনসংখ্যার অনুপাত (জেন্ডার ও বয়স অনুযায়ী)

জাতীয় স্তরে দারিদ্র্য অর্থাৎ, জাতীয় মৃদু দারিদ্র্য রেখার নিচে বাসরত জনগোষ্ঠীর অনুপাত, নিয়মিত নিম্নমুখী হয়ে ২০১০ ও ২০১৬ সালে যথাক্রমে ৩১.৫ ও ২৪.৩ শতাংশে দাঁড়ায়। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক হিসাব মতে ২০১৮ সালে দারিদ্র্যের এই হার হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ২১.৬ শতাংশে।

সারণি ১.২ উচ্চ দারিদ্র্য রেখা (২১২২ ক্যালরি/দিন) এবং হত দারিদ্র্য রেখার ভিত্তিতে দারিদ্র্য প্রবণতা ১৯৯২-২০১৮

	১৯৯১-৯২	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬	২০১৮[১]
উচ্চ দারিদ্র্য রেখা						
জাতীয়	৫৬.৭	৪৮.৯	৪০	৩১.৫	২৪.৩	২১.৬
শহর	৪২.৮	৩৫.২	২৮.৪	২১.৩	১৮.৯	১৬.৩
গ্রাম	৫৮.৮	৫২.৩	৪৩.৮	৩৫.২	২৬.৪	২৪.৫
নিম্ন হত দারিদ্র্য রেখা						
জাতীয়	৪১	৩৪.৩	২৫.১	১৭.৬	১২.৯	৯.৪
শহর	২৪	১৯.৯	১৪.৬	৭.৭	৭.৬	৬.১
গ্রাম	৪৩.৮	৩৭.৯	২৮.৬	২১.১	১৪.৯	১১.২

উৎস: বিবিএস, খানার আয় ও ব্যয় সমীক্ষা, বিভিন্ন বছর

১। প্রক্ষেপিত

উল্লিখিত সময়কালে চরম দারিদ্র্যের (নিম্ন দারিদ্র্য রেখা) নিচে থাকা অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অব্যাহতভাবে উপরে উঠে এসেছে। জিইডি'র অতি সাম্প্রতিক হিসাবে দেখা গেছে, ২০১৮ সালে চরম দারিদ্র্য হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১১.২ শতাংশ।

১.৩.১ সামাজিক সুরক্ষার আওতায় অনুপাত (জেন্ডার/শিশু/বেকার/বৃদ্ধ/অক্ষম/গর্ভবতী/নবজাতক/কাজে আঘাতপ্রাপ্ত/দরিদ্র/ঘাতোপযোগী)

এটা আজ সুবিদিত যে দারিদ্র্য, ঘাতোপযোগিতা এবং প্রান্তিকতা দূর করার প্রত্যয় নিয়ে বাংলাদেশ সরকার বহুবিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির (এনএসএসএস) সূচনা করেছে। সময়ের সাথে সাথে সামাজিক সুরক্ষা সুবিধা খানা ও সুবিধাভোগী উভয়ের শতাংশের নিরিখে বিস্তৃতি লাভ ঘটেছে।

1 Sample Household Survey, GED, Planning Commission for "Study on Employment, Productivity and Sectoral Investment in Bangladesh"

সারণি ১.৩ সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বিস্তৃতি প্রবণতা, ২০০৫-২০১৬ সাল

সমীক্ষার বছর	জাতীয়	শহর	গ্রাম
২০১৯*	৫৮.১	৫৩.১	৫৯.৫
২০১৬	২৮.৭	১০.৬	৩৪.৫
২০১০	২৪.৬	৯.৪	৩০.১
২০০৫	১৩.০৬	৫.৪৫	১৩.০৬

উৎস: বিবিএস, এইচআইইএস, বিভিন্ন বছর

* বাংলাদেশ মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (এমআইসিএস) ২০১৯

১.ক.২ জরুরি সেবাখাতে সরকারি ব্যয়ের অনুপাত (শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সামাজিক সুরক্ষা)

২০১৫ অর্থবছরে জরুরি এই সেবাগুলোতে সরকারি মোট ব্যয়ে স্বাস্থ্যখাতের অংশ ছিল ৪.৮১ শতাংশ, শিক্ষার ১২.৮২ শতাংশ এবং সামাজিক সুরক্ষার ১২.৭২ শতাংশ। তবে ২০১৬ - ১৭ অর্থবছরে স্বাস্থ্যখাতের অংশ সর্বোচ্চ ৬.৫৩ শতাংশে উঠে আসে। ২০১৬ অর্থবছরে শিক্ষাখাতে ব্যয়ের অংশ সর্বোচ্চ ১৫.১৫ শতাংশে উঠে যা তার পরের বছর থেকে কমতে থাকে। সামাজিক সুরক্ষা খাতে সর্বোচ্চ ১৫.২৫ শতাংশ ব্যয় হয় ২০১৬ - ১৭ সালে। মোট কথা, এই তিনটি খাতের সরকারি ব্যয়ে মিশ্র প্রবণতা প্রত্যক্ষ করা গেলেও ভবিষ্যতে শিক্ষাখাতের অংশ বৃদ্ধি ঘটাতে পারলে ২০২০ মাইলফলকে পৌঁছায়ে যাবে বলে আশা করা যেতে পারে।

সারণি ১.৪ মোট বাজেট ব্যয়ের অংশ হিসাবে বিভিন্ন সেবায় সরকারি ব্যয় (%)

সেবা	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
শিক্ষা	১৩.৩৯	১২.৮২	১৫.১৫	১৪.৪২
স্বাস্থ্য	৪.৬০	৪.৮১	৪.৮০	৬.৫৩
সামাজিক সুরক্ষা	১২.৩০	১২.৭২	১৩.৬০	১৫.২৫

উৎস: অর্থমন্ত্রণালয়ের বাজেট তথ্য থেকে হিসাবকৃত

১.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

দারিদ্র্য হচ্ছে একটা বহুমাত্রিক ধারণা এবং এটা মোকাবেলা করতে গেলে সরকারের সর্বাত্তকরণ প্রচেষ্টার প্রয়োজন। এসডিজির নানামুখী লক্ষ্যমাত্রার জন্য মন্ত্রণালয়গুলোকে দায়িত্ব বন্টন করতে গিয়ে দেখা গেল ৪৪টি মন্ত্রণালয়/বিভাগ এই অভীষ্ট অর্জনের সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িত। তাই বলার অপেক্ষা রাখে না যে মন্ত্রণালয়/বিভাগগুলোর মধ্যে কার্যকর সমন্বয় সফলতার পথে একটা বড় চ্যালেঞ্জ হিসাবে সামনে এসে দাঁড়ায়।

সম্পদ আহরণ বিশেষত বহি:সম্পদ আহরণ একটা বড় চ্যালেঞ্জ। জাতীয় সামাজিক সুরক্ষা কৌশলের জন্য প্রয়োজন পর্যাপ্ত পরিমাণে সম্পদ বরাদ্দ বৃদ্ধি ও দক্ষতার পথে বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা। তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো ও জাতীয় পরিসংখ্যান সংগঠনের

দক্ষতা দ্রুত বৃদ্ধি করা দরকার যাতে করে এসডিজি ১ অগ্রগতি পর্যবেক্ষণ ও গুণগত তথ্য-প্রাপ্তির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করে অন্যান্য উৎসের সাথে তুলনা করা যায়। বাংলাদেশে বহু খানা আছে যারা দারিদ্র্যরেখার খুব কাছাকাছি অবস্থান করে বিধায় ছোট-খাটো দূর্যোগে দারিদ্র্য রেখার নিচে পড়ে যায়। ফলে তারা অর্জিত সকল সুবিধা হারিয়ে পুনরায় দারিদ্র্য বৃত্তে নিপতিত হয়।

১.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

ক্রমবর্ধিষ্ণু শ্রমবাজারে কর্মসংস্থান সৃষ্টির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার লক্ষ্যে অর্থনীতিতে উৎপাদনক্ষম এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে আগত শ্রমিকদের জন্য কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিচ্ছে। প্রত্যাশা করা যায় যে সরকারি ও বেসরকারি এবং বৈদেশিক উৎস থেকে আসা বর্ধিষ্ণু বিনিয়োগ ঘটার মাধ্যমে উঁচু প্রবৃদ্ধি ঘটবে এবং তা ছড়িয়ে পড়বে দারিদ্রের আয়ত্বে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হলে বেশ কিছু ক্ষেত্রে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন যথা: ব্যবস্থাপনা দক্ষতার উন্নয়ন, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষতা, শ্রমদক্ষতা উন্নীতকরণ, নিয়ন্ত্রণকারী বাধাগুলো কমিয়ে আনা এবং জ্বালানি সহায়তা নিশ্চিত করা (যা বর্তমানে অর্জিত হয়েছে)।

খাদ্য নিরাপত্তার ওপর জোর দেয়া অব্যাহত থাকবে সন্দেহ নেই, তবে কৃষি বহুমুখীকরণ অধিকতর গুরুত্ব পাবে। আর সেটা হবে একদিকে ভূমি ও শ্রমের উৎপাদিকা বাড়িয়ে, এবং অন্যদিকে গুণগত উপকরণ, যথাযথ যন্ত্রায়ন এবং অবকাঠামো নিশ্চিত করার মাধ্যমে। অপরদিকে, উৎপাদনশীল খাতে তৈরি পোষাকের অব্যাহত সফলতার ওপর গুরুত্বারোপ চলবেই এবং একই সাথে অন্যান্য সম্ভাব্য শ্রম-নিবিড় কর্মকান্ড যথা: চামড়া, জুতা, প্লাস্টিকস, খেলনা, ইলেক্ট্রনিকস, পাটজাত দ্রব্য, ঔষধ এবং লাইট ইঞ্জিনিয়ারিং এ সাফল্য আনার প্রয়োজন রয়েছে।

২০১৯ সালে খর্বকায় মানুষের অনুপাত দাড়িয়েছে ২৮.০ শতাংশে। যে হারে খর্বকায় শিশুর অনুপাত হ্রাস পাচ্ছে তা প্রত্যাশিত পর্যায়ে আছে বলে ধরে নেয়া যায়। একইভাবে কৃশতা হ্রাসের অগ্রগতির হার ৮.৪ শতাংশও যথাযথ আছে। কৃষি খাতে মোট সরকারি সম্পদ প্রবাহ অপেক্ষাকৃত কম থাকার প্রধান কারণ সময়ের বিবর্তনে উন্নয়ন সহযোগিদের সাহায্য বন্টণের ক্ষেত্র নির্ধারণে নীতিমালায় পরিবর্তন। আর তাই এসডিজির বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রবাহকে কৃষি ব্যবস্থা রূপান্তরের কাজে লাগানোর প্রয়োজন রয়েছে। শিশুদের স্থূলতা একটি অন্যতম উদীয়মান সমস্যা হয়ে দাড়িয়েছে।

ইতোমধ্যে জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে সরকার-সূচিত ইতিবাচক নীতি ও কর্মসূচি ছাড়াও ক্ষুধা এবং পুষ্টি সংক্রান্ত সমস্যা নিরসনে নির্দিষ্ট কিছু কর্মসূচিও হাতে নেয়া হয়েছে। এর মধ্যে আছে পুষ্টি সমৃদ্ধ বা ফরটিফাইড চালের প্রচলন, গর্ভবতী, স্তন্যদানকারী মায়েদের ও কিশোরীদের মধ্যে আয়রণ-ফলিক সাপ্লিমেন্ট বিতরণ, শিশুদের জন্য ভিটামিন-এ বিতরণ, কৃমিরোধে ব্যবস্থা নেয়া, আয়োডাইজড লবণ, শিশুদের মায়ের দুধ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে মায়েদের মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধি এবং ওয়াশ কর্মসূচির আওতায় মানসম্মত পানি, পয়:নিস্কাশন ও স্বাস্থ্যের উন্নতির ব্যবস্থা নেয়া ইত্যাদি।

২.১ এসডিজি-২ এ বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন

২.১.১ অপুষ্টির ব্যাপকতা

এক হিসাবে দেখা যায়, অপুষ্টিজনিত কারণে বাংলাদেশে প্রতিবছর যে উৎপাদনশীলতার ক্ষতি হয় তার আর্থিক দাম ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের অধিক (এফএও ২০১৬)। এর সাথে, যদি স্বাস্থ্য পরিচর্যা খরচ বিবেচনায় নেয়া হয়, তা হলে অংকটা যে আরও বেশি হবে তা বলাই বাহুল্য। যাই হোক, ২০১৬ সালে মোট জনসংখ্যার ১৬.৪ শতাংশ অপুষ্টিতে ছিল যার অর্থ এ দেশে প্রায় ২৬ মিলিয়ন মানুষ অপুষ্টির শিকার (এফএও ২০১৬)। তবে উৎসাহব্যঞ্জক ব্যাপার হলো অপুষ্টি ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে (সারণি ২.১)।

সারণি ২.১: অপুষ্টির ব্যাপকতা (%) (ত্রিবর্ষীয় গড়)

নির্দেশক	২০১১-২০১৩	২০১২-২০১৪	২০১৩-২০১৫	২০১৪-২০১৬	২০১৫-২০১৭	২০১৬-২০১৮
অপুষ্টির ব্যাপকতা	১৬.৯	১৬.৬	১৬.২	১৫.৭	১৫.২	১৪.৭

উৎস: এফএওস্ট্যাট, এফএও, ২০১৯

২.২.১: ৫ বছর নিচে শিশুর মধ্যে খর্বতার ব্যাপকতা

দীর্ঘকাল ধরে পর্যাপ্ত পুষ্টি অভাবের প্রতিফলন বা ফলাফল হচ্ছে খর্বতা এবং বার বার ও দীর্ঘস্থায়ী অসুস্থ্যতার কারণে এর অবণতি ঘটে। তবে স্বীকার করতেই হবে যে, এই

ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিছুটা অগ্রগতি সাধন করেছে যেমন, ১৯৯৯-২০০০ সময়কালের খর্বকায় শিশুর অনুপাত ৪৫ শতাংশ থেকে ২০১৯ সালে ২৮ শতাংশে নেমে এসেছে (এমআইসিএস ২০১৯)।

সারণি ২.২: পাঁচ বছরের নিচে শিশুর মধ্যে খর্বতার ব্যাপকতা (%)

নির্দেশক	১৯৯৯-২০০০	২০০৪	২০০৭	২০১১	২০১৪	২০১৭-২০১৮*	২০১৯**
খর্বিত বিকাশ	৪৫	৫১	৪৩	৪১	৩৬	৩০.৮	২৮.০

উৎস: নিপোর্ট, বিডিএইচএস, বিভিন্ন বছর।

*এফএওস্ট্যাট, এফএও, ২০১৯

** এমআইসিএস ২০১৯

২.২.২: পাঁচ বছরের নিচে শিশুর মধ্যে পুষ্টিহীনতার ব্যাপকতা (খর্বতা এবং স্থূলতা)

আমাদের দেশে খাদ্য, শাকসব্জি ও প্রাণী -প্রোটিনের উৎপাদন বৃদ্ধি স্বত্ত্বেও সময়ের বিবর্তনে শিশুদের মধ্যে উঁচুমাত্রায় অপুষ্টির অবসানে তেমন উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় না। যাই হোক, উঠানামা নিয়ে কৃশকায় শিশুদের অনুপাত ১৯৯৯-২০০০ সালের ১০ শতাংশ থেকে ২০০৭ সালে সর্বোচ্চ ১৭ শতাংশে পৌঁছায় এবং তারপর থেকে ক্রমাগত হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে দাঁড়ায় ৯.৮ শতাংশে। অপরদিকে, পাঁচ বছরের নিচে শিশুর মধ্যে স্থূলতা ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলছে। ১৯৯৯-২০০০ সালে পাঁচ বছরের নিচে স্থূলকায় শিশুর অনুপাত ০.৯ শতাংশ হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ২.৪ শতাংশ হয়েছে।

সারণি ২.৩: পাঁচ বছরের নিচে শিশুর মধ্যে অপুষ্টির ব্যাপকতা (%)

নির্দেশক	১৯৯৯-২০০০	২০০৪	২০০৭	২০১১	২০১৪	২০১৭*	২০১৯**
রুদ্ধ বিকাশ	১০	১৫	১৭	১৬	১৪	৮.৪	৯.৮
স্থূল বিকাশ	০.৯	০.৯	১.১	১.৯	১.৪	১.৪	২.৪

উৎস: নিপোর্ট, বিডিএইচএস, বিভিন্ন বছর

*এফএওস্ট্যাট, এফএও, ২০১৯

** এমআইসিএস ২০১৯

২.ক.১: সরকারি ব্যয়ের ও কৃষি পরিস্থিতির সূচক বা এগ্রিকালচারাল অরিয়েন্টেশন ইনডেক্স (এওআই)

বাংলাদেশ সরকার সহায়তামূলক নীতিমালা, সংস্কার এবং উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে উৎসাহ প্রদানের মাধ্যমে কৃষিতে প্রযুক্তির প্রসার ঘটাবার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারি ব্যয়ে কৃষিমুখীতা সূচকের (এওআই) মাধ্যমে অন্যান্য খাতের তুলনায় কৃষিতে সরকারি ব্যয়ের প্রতিশ্রুতির প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যায়।

এওআই এর মান ১-এর বেশি হলে বুঝতে হবে অর্থনীতিতে কৃষির অবদানের তুলনায় সরকার ব্যয়ে কৃষিকে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। অপরপক্ষে, ১-এর কম হলে ধরে নেয়া হয় যে কৃষির তুলনায় অন্যান্য খাত সরকারের কাছ থেকে অধিকতর গুরুত্ব পাচ্ছে। রূপান্তরিত অর্থনীতিতে, প্রথাগত খাতের তুলনায় উৎপাদনখাত বিশেষভাবে সেবা এবং শিল্পায়ন অগ্রাধিকার পেতেই পারে।

সারণি ২.৪: বাংলাদেশে কৃষিমুখীতা সূচকের প্রবণতা, ২০০১-২০১৬

	২০০৫	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬
এওআই	০.২৮	প্রাপ্ত নয়	০.৫২	০.৫৮	০.৭৮	০.৫৬	০.৫৩	০.৪১

উৎস: এফএওস্ট্যাট, এফএও

২.ক.২: কৃষিখাতে মোট সরকারি অর্থ প্রবাহ (মিলিয়ন ইউএস ডলারে)

কৃষিতে প্রয়োজনীয় সরকারি ব্যয়ের জন্য উন্নত দেশগুলোর উচিত অনুন্নত দেশগুলোতে পর্যাপ্ত সাহায্যের হাত প্রসারিত করা। কারণ, এসব দেশের কৃষিতে প্রাপ্ত অভ্যন্তরীণ সম্পদ ও প্রত্যাশিত সরকারি বিনিয়োগের মধ্যে বিরাট ব্যবধান বিদ্যমান রয়েছে। বাংলাদেশের কৃষিখাতে বাহিরের সহায়তা প্রবাহের প্রবণতায় উঠানামা আছে। ২০১৪ সালে বাংলাদেশের কৃষিখাতে মোট সাহায্য প্রবাহ সর্বোচ্চ ৩৬৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পৌছায় কিন্তু তারপর ক্রমাগত হ্রাস পেতে থাকে।

সারণি ২.৫: কৃষি খাতে মোট বৈদেশিক সহায়তা প্রবাহ (উন্নয়ন সাহায্য ও অন্যান্য সহায়তা প্রবাহ), ২০১২ থেকে ২০১৭ (মিলিয়ন ইউএস ডলার)

	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
মোট সহায়তা প্রবাহ (ঋণ এবং সাহায্য)	৩৪.৯৯	৬৫.০১	৩৬৩.০২	২১০.৫৭	১৭৭.৮৩	১৯২.৫৮

উৎস : এআইএমএস ওয়েব পোর্টাল, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

তবে সাহায্য প্রাপ্তির উঠানামা স্বত্বেও বাংলাদেশের কৃষিখাত এখনও বড় দাগে সাহায্য প্রবাহ আকৃষ্ট করতে পারে যদি উন্নয়ন সহযোগীগণ তাদের সাহায্য নীতি এসডিজির সাথে সমন্বিত করতে সমর্থ হয়।

২.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

ক্ষুধার প্রকোপ শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনার চ্যালেঞ্জটি বদ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ বাস্তবায়নের সাথে সম্পর্কিত। এই পরিকল্পনায় আছে ভবিষ্যত অনিশ্চয়তাকে গুরুত্ব দিয়ে সামনে পা বাড়ানোর কথা যথা: জলবায়ু পরিবর্তন, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা, অবহেলিত অঞ্চল ও গোষ্ঠীর ক্ষুধা হ্রাসকল্পে পদক্ষেপ, নগরায়ন সমস্যা মোকাবেলা এবং অভিঘাতসহনশীল একটা জনগোষ্ঠী তৈরি করা। সরকার এরই মধ্যে এ সমস্ত চ্যালেঞ্জ শনাক্ত করেছে এবং আশা করা যায় যে, এগুলো মোকাবেলা করতে শীঘ্রই ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় প্রয়োজনীয় নীতিমালা গ্রহণ করা হবে।

দেশের সর্বত্র ক্ষুধাজনিত পরিস্থিতি এক নয়। এখনও এক-তৃতীয়াংশের বেশি শিশু খর্বতায় আক্রান্ত এবং খাদ্য ঘাটতির সময়ে এখনও পুরুষের তুলনায় নারীরা দুর্ভোগের শিকার হয় বেশি অর্থাৎ নারী খাদ্য-বঞ্চনার শিকার হয় অধিকমাত্রায়। দরিদ্র, অরক্ষিত ও আক্রান্ত মানুষের মধ্যে অভিঘাত সহনশীলতা সৃষ্টির জন্য তাদের মাঝে নমনীয় ও তীব্র অভিঘাত যথা: খরা, সাইক্লোন, বন্যা ইত্যাদির মুখোমুখি হবার ক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে। এতে করে তারা দারিদ্র্যের তলানি থেকে উঠে এসে আবার কোনো অভিঘাতে পিছলে পড়বে না।

২.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

জনসংখ্যা ও আয় বৃদ্ধির সাথে সংগতি রাখতে একটা সমৃদ্ধশীল কৃষিখাতের প্রয়োজনীয়তা যে অনস্বীকার্য তা বলাই বাহুল্য। কৃষি গবেষণায় সরকারি বিনিয়োগ অব্যাহত রাখা হবে। তবে এই কৃষি গবেষণায় বিনিয়োগের জন্য নতুন ক্ষেত্র হচ্ছে পানি ও সার সংক্রান্ত দুর্যোগ সহনীয় শস্যের উদ্ভাবন ও উন্নয়ন, বৈশ্বিক উষ্ণতা, জিএম প্রযুক্তি এবং কৃষক কর্তৃক নতুন নতুন আধুনিক প্রযুক্তি পরিগ্রহণ। তাছাড়া, বিশেষত সেচ কর্মকান্ডে বিনিয়োগের উদ্দেশ্য হবে ভূ-উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ সম্প্রসারণ এবং ক্ষুদ্র সেচকাজে নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিস্তৃত ব্যবহার ।

পিছিয়ে পড়া অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর জন্য অধিক সম্পদ বরাদ্দে, ব্যক্তি বিনিয়োগ উৎসাহিতকরণে, অবকাঠামো নির্মাণে এবং বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল সৃষ্টিতে, বিস্তৃত সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি ও বিস্তৃতি ক্ষুদ্র কর্মসূচি প্রভৃতি কর্মকান্ডে সরকারের অধিকতর দৃষ্টি দিতে হবে।

এসডিজি ৩: সকল বয়সী সকল মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ

এমআইসিএস ২০১৯ অনুযায়ী, শিশু সম্পর্কিত নির্দেশকসমূহ ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সঠিক পথে আছে। উদাহরণস্বরূপ, ৫ বছরের কমবয়সী শিশু মৃত্যুহার ২০২০ সালের প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ৪০ এবং নবজাতক মৃত্যুর হার প্রতি হাজার জীবিত জন্মে ২৬ হবে। এছাড়া, নারী বিষয়ক বেশ কিছু লক্ষ্যমাত্রা মাইলফলক ছুঁইছুঁই করছে যেমন, শিশু জন্মকালে সেবা প্রদানে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবিকার সংখ্যা, আধুনিক জন্মনিরোধক ব্যবহারকারী বিবাহিত মহিলাদের অনুপাত এবং কিশোরী মায়েদের (১৫-১৯ বছর বয়সী) স্বাস্থ্য সংক্রান্ত ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের প্রায় দোরগোড়ায়। ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রতি ১০,০০০ জনের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীর ঘনত্বের কাঙ্খিত মাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে যথাযথ পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

সরকার ১৯৯৮ সাল থেকে স্বাস্থ্যখাতের জন্য খাত-বিস্তৃত পদ্ধতি অনুসরণ করে আসছে। বর্তমানে বাস্তবায়িত হচ্ছে ২০১৭-২২ সময়কালে বাস্তবায়ীতব্য চতুর্থ সেক্টর কর্মসূচি-Health, Population and Nutrition Sector Programme (HPNSP)। এ কর্মসূচির আওতায় আছে তিনটি অংশ যেমন, সংশ্লিষ্ট খাতের শাসন ও দায়িত্বসমূহ, শক্তিশালী স্বাস্থ্যব্যবস্থা এবং মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবা। এর উদ্দেশ্য হলো স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা ও পুষ্টিখাতে লক্ষ্যমাত্রা এবং এসডিজির স্বাস্থ্য সম্পর্কিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা।

৩.১ এসডিজি-৩ এ বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন

৩.১.১ মাতৃ মৃত্যুর অনুপাত (প্রতি ১০০,০০০ জীবিত জন্মে)

১৯৯৫ সাল থেকে মাতৃ মৃত্যুহার ক্রমান্বয়ে নিম্নগামী এবং ২০১৮ সালেও তা অব্যাহত থেকেছে। মাতৃ স্বাস্থ্যসেবার উন্নতির প্রেক্ষিতে গ্রামীণ ও নগরে মাতৃ মৃত্যুর হারের মধ্যে যে বৈষম্য বিদ্যমান ছিল তা উল্লেখযোগ্যভাবে কমে এসেছে।

সারণি ৩.১ মাতৃ মৃত্যুর অনুপাত, ১৯৯৫-২০১৬ (প্রতি ১ লক্ষে)

	১৯৯৫	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
জাতীয়	৪৪৭	৩১৮	৩৪৮	২১৬	১৮১	১৭৮	১৭২	১৬৯
গ্রাম	৪৫২	৩২৯	৩৫৮	২৩০	১৯১	১৯০	১৮২	-
শহর	৩৮০	২৬১	২৭৫	১৭৮	১৬২	১৬০	১৫৭	-

উৎস: বিবিএস, এসভিআরএস, বিভিন্ন বছর

৩.১.২ প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি (%)

দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মী ও ধাত্রীদের উপস্থিতিতে শিশু জন্মের অনুপাত ২০০৭ সালে ২০.৯ শতাংশ থেকে ২০১৪ সালে ৪২.১ শতাংশে এবং ২০১৯ সালে আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯ শতাংশে

দাঁড়িয়েছে। আশা করা যায়, এই অনুপাত ২০২০ সালের মধ্যে দাঁড়াবে ৬৫.৭ শতাংশে যার অর্থ অগ্রগতি প্রত্যাশিত স্তরে আছে (অন ট্র্যাক)। তারপরেও প্রশিক্ষিত প্রসূতি সেবা প্রদানকারী স্বাস্থ্যকর্মীদের মাধ্যমে শিশুর জন্ম নিশ্চিত করা একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবেই থেকে যাচ্ছে।

সারণী ৩.২ প্রসবকালে দক্ষ স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি (%)

	২০০৭	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১৩	২০১৪	২০১৬	২০১৭-১৮	২০১৯*
শিশু জন্মের সময় প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মীর উপস্থিতি	২০.৯	২৪.৪	২৬.৫	৩১.৭	৩৪.৪	৪২.১	৫০	৫২.৭	৫৯.০

*উৎস: নিপোর্ট, বিডিএইসএস, বিভিন্ন বছর; *এমআইসিএস ২০১৯, বিবিএস*

৩.২.১ অনুর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশুমৃত্যুর হার (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)

২০০০ সাল থেকে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশু মৃত্যুহার ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে এবং ২০১৮ তেও একই ধারা অব্যাহত রয়েছে। প্রাথমিকভাবে গ্রামীণ ও শহর এলাকায় শিশু মৃত্যুহারের মধ্যে বিরাট পার্থক্য দেখা গেলেও বর্তমানে তা কমে এসেছে। পাঁচ বছরের নিচে শিশু মৃত্যুহার সম্পর্কিত ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা।

সারণি: ৩.৩ অনূর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশুর মৃত্যুহার, (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)

	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯*
জাতীয়	৯০	৭১	৪৮	৩৯	৩৬	৩৩	-	৪১
শহর	৫৫	৫৬	৪৪	৩২	৩২	২৭	-	৩৫
গ্রাম	৮৪	৬৮	৪৭	৩৬	৩৫	৩১	২৯	৪০

*নিপোর্ট, বিডিএইসএস, বিভিন্ন বছর; *এমআইসিএস ২০১৯, বিবিএস*

৩.২.২ নবজাতকের মৃত্যুহার, (প্রতি ১০০০ জীবিত জন্মে)

২০০০-১৫ সময়ের মধ্যে নবজাতক মৃত্যুহার ধারাবাহিকভাবে হ্রাস পেয়েছে, তবে হ্রাসের মাত্রা ক্রমান্বয়ে কমে গেছে। এছাড়া, গ্রামীণ ও নগর বৈষম্য দূর হয়ে নবজাতকের মৃত্যুহার জাতীয় পর্যায়ের কাছাকাছি পৌঁছেছে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য এসেছে। আশা করা যায় যে, এই প্রবণতা চালু থাকলে ২০২০ সালের মধ্যে নবজাতকের মৃত্যুহার প্রায় ১৩ তে নেমে আসবে। সর্বশেষ এমআইসিএস (MICS) ২০১৯ তথ্য লক্ষ্য অর্জনের বার্তা বহন করে না।

সারণি : ৩.৪ নবজাতক মৃত্যুহার (প্রতি ১০০০ জন জীবিত নবজাতকের মধ্যে)

	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯*
জাতীয়	৪৩	৩৫	২৬	২১	২০	১৯	১৭	-	২৭
শহর	২৮.	২৮	২৫	১৯	২০	২০	১৭	-	২৪
গ্রাম	৩৯	৩৩	২৬	২১	২০	১৯	১৭	১৬	২৬

উৎস্য : নিপোর্ট, বিডিএইসএস, বিভিন্ন বছর;এমআইসিএস ২০১৯, বিবিএস

৩.৩.১ জেন্ডার, বয়স এবং মূল জনসংখ্যা অনুসারে প্রতি ১০০০ এইচআইভি নতুন আক্রান্তের সংখ্যা

বাংলাদেশে এইচআইভি/ এইডস এর প্রাদুর্ভাব বরাবরই কম। জাতীয় পর্যায়ে ২০১৬ সালে ১৫-৪৯ বছর বয়সী নারী ও পুরুষের মধ্যে এইচআইভি আক্রান্তের হার ছিল ০.০৪ শতাংশ (<০.১ শতাংশ নারী ও পুরুষ উভয়ের জন্য) যা ২০১৭ সালে হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ০.০১ শতাংশেরও নিচে (ইউএনএইডস-২০১৭)।

৩.৩.২ প্রতি ১০০,০০০ জনে যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা

২০১৫ সালে সকল ধরণের যক্ষা রোগের আনুমানিক ঘটনার হার প্রতি ১০০০ জনে ছিল ২২৫জন এবং একই বছরে প্রতি ১ লাখে ৪৫ জন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে (এনটিপি, বার্ষিক প্রতিবেদন ২০১৭)। বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার বৈশ্বিক (গোবাল) টিবি রিপোর্ট ২০১৭ অনুযায়ী, যক্ষা রোগের প্রাদুর্ভাব পূর্বের হার অপেক্ষা হ্রাস পেয়ে ২২১ জনে (প্রতি ১০০০ জনে) দাঁড়িয়েছে।

৩.৩.৩ প্রতি ১০০০ জনে ম্যালেরিয়া রোগে আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার প্রধান ম্যালেরিয়া আক্রান্ত দেশগুলোর মধ্যে একটি বাংলাদেশ। ম্যালেরিয়া দেশের জনস্বাস্থ্যের জন্য বিরাট একটি উদ্বেগের বিষয়। ২০১৫ সালে প্রতি ১০০০ জন মানুষের মধ্যে ম্যালেরিয়া আক্রান্ত ছিল ৪.৩ জন (এমডিজি ২০১৫) যা ২০১৭ সালে হ্রাস পেয়ে ১.৫৮ জনে দাঁড়িয়েছে (হেলথ বুলেটিন ২০১৭)।

৩.৭.১ আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবার পরিকল্পনা চাহিদা পূরণ করা হয়েছে প্রজনন সক্ষম (১৫- ৪৯ বছর) এমন নারীর অনুপাত

২০১২-১৩ সালে প্রজনন বয়সী (১৫-৪৯) নারীদের মধ্যে ৮১.৭ শতাংশ নারী আধুনিক পদ্ধতির পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণে সন্তোষ প্রকাশ করেছিল যা পরবর্তীতে হ্রাস পেয়ে ২০১৯ সালে ৭৭.৪ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। শহর এবং গ্রামে আধুনিক পরিবার পরিকল্পনা সেবা গ্রহণের ফলে সন্তুষ্ট নারীর অনুপাত যথাক্রমে ৭৮.৫ শতাংশ এবং ৭৭.০ শতাংশ। সেবা সন্তুষ্টির হার বাড়াতে হবে।

৩.৭.২ প্রতি ১০০০ কিশোরী মায়েদের মধ্যে (১০-১৪ বছর বয়সী, ১৫-১৯ বছর বয়সী) সন্তান জন্মদানের হার

এমআইসিএস ২০১৯ এর তথ্যানুযায়ী, ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরী মায়েদের প্রতি ১০০০ জনে সন্তান জন্মদানের হার ৮৩। ২০১২-১৩ সাল থেকে এ হার অপরিবর্তিত রয়েছে। এ বিষয়ে সমন্বিত পদক্ষেপ প্রয়োজন।

৩.খ.১ টেকসই ভিত্তিতে ও সাশ্রয়ী মূল্যে ঔষধ ও টিকা সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত

টেকসইভাবে সাশ্রয়ী ওষুধ ও ভ্যাকসিন প্রাপ্তির ভিত্তিতে জনসংখ্যার অনুপাত ২০১৪ সালে ছিল ৭৮ শতাংশ (বিডিএইচএস, ২০১৪)। তবে বিডিএইচএস ২০১৭-১৮ এর তথ্যানুযায়ী উক্ত অনুপাত বৃদ্ধি পেয়ে ৮৫.৬ শতাংশে দাঁড়িয়েছে।.

৩.খ.২ চিকিৎসা বিষয়ক গবেষণা ও মৌলিক স্বাস্থ্যখাতে সরকারি উন্নয়ন সহায়তার (ওডিএ) নীট পরিমাণ

স্বাস্থ্য গবেষণা ও মৌলিক স্বাস্থ্যখাতে মোট নীট সরকারি উন্নয়ন সহায়তা ২০১২ সালে ছিল ২৭৪.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, ২০১৫ সালে যার পরিমাণ কমে দাঁড়ায় ১৭৭.৪ মিলিয়ন। ২০১৭ সালে এই সহায়তার পরিমাণ আবার বেড়ে দাঁড়ায় ২৫২.৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ২০১৫ সাল থেকে মোট নীট বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তার ওঠা নামায় একটি উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

সারণি ৩.৫ মেডিকেল চিকিৎসা গবেষণা ও মৌলিক স্বাস্থ্যখাতে সরকারি উন্নয়ন সহায়তার (ওডিএ) নীট পরিমাণ ২০১২- ২০১৬ (মিলিয়ন ইউএস ডলার)

২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭
২৭৪.১	২২৪.১	২৪২.৭	১৭৭.৪	২০৬.২	২৫২.৫

উৎস: অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

৩.গ.১ প্রতি ১০,০০০ জনে স্বাস্থ্যকর্মীর ঘনত্ব এবং বন্টন (চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্য প্রযুক্তিবিদ)

বাংলাদেশে একদিকে যেমন স্বাস্থ্যকর্মীর বিরাট ঘাটতি রয়েছে অন্যদিকে তেমনি স্বাস্থ্যকর্মীদের বিতরণেও রয়েছে ত্রুটি। ২০১৬ সালের হিসাব মতে এখানে প্রতি ১০,০০০ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘনত্ব ৭.৪। বর্তমানে স্বাস্থ্যকর্মীদের ঘনত্ব আগের চেয়ে বেড়েছে। ২০১৭ এর তথ্য অনুসারে প্রতি ১০,০০০ জনে বর্তমান ঘনত্ব ৮.৩ এবং বন্টন অনুপাত ১: ০.৫৬: ০.৪০ (এইচআরডি ইউনিট, এইচআরএইচ কান্ট্রি প্রোফাইল, ২০১৭, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়)। সুতরাং ২০২০ সালের মধ্যে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছাতে ঠিক পথেই এগোচ্ছে বলা চলে।

৩.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশের স্বাস্থ্যখাতে সকলের জন্য সুযোগ বৃদ্ধি এবং উন্নতমানের স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ন্যায় ও সমতা অর্জনে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ সমাধানে জোর প্রচেষ্টা চলছে। রোগব্যাধি ও মৃত্যুহার বৃদ্ধিতে নানা ধরণের অ-সংক্রামক রোগ যেমন-ডায়াবেটিস, হৃদরোগ এবং ক্যান্সারের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই খাত বিভিন্ন ধরণের নতুন নতুন চ্যালেঞ্জ যেমন- আগুনে পোড়া ও এ্যাসিড দগ্ধ, পানিতে ডুবে যাওয়া, সড়ক দুর্ঘটনা, হেপাটাইটিস বি ও সি, বিভিন্ন সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব, জীবানু-সংক্রান্ত বিপর্যয়, আর্সেনিকোসিস এবং বার্ধক্যজনিত রোগ প্রভৃতির সম্মুখীন হচ্ছে।

এছাড়াও স্বাস্থ্য খাতে সচরাচর নিম্নলিখিত চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি হতে হয়ঃ

১. ইউএইচসি অর্জনের লক্ষ্যে রোগী কর্তৃক সরাসরি নিজের পকেট থেকে ব্যয় হ্রাস করা;

২. শহুরে প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষ করে দরিদ্রদের জন্য প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহ নিশ্চিত করা;

৩. মাতৃ মৃত্যুহার কমানোর লক্ষ্যে দক্ষ জন্মসেবকের সংখ্যা বৃদ্ধি নিশ্চিত করা;

৪. কম ওজন এবং খর্বাকৃতিসহ সামগ্রিক পুষ্টি পরিস্থিতির উন্নয়ন করা;

৫. সেবার মান, মানদন্ড এবং সেবার গুণগত মানের জন্য স্বীকৃতি উন্নয়ন;

৬. এইচডব্লিউ কৌশল বাস্তবায়নের মাধ্যমে দক্ষতা সম্পন্ন মানব সম্পদের প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

৭. দরিদ্রদের মৌলিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য বেসরকারি খাত এবং সমাজের মধ্যে অংশীদারিত্ব বৃদ্ধিসহ নতুন পদ্ধতি তৈরি করা;

৮. ইউএইচসি অর্জনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্যখাতে টেকসই অর্থায়ন এবং সমতা বৃদ্ধি;

৯. স্বাস্থ্যকর্মীর তীব্র ঘাটতি এবং দক্ষতায় ভারসাম্যহীনতা; এবং

১০. অপর্যাপ্ত কিশোর বান্ধব স্বাস্থ্যসেবা।

৩.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

মাতৃমৃত্যু ও নবজাতকের স্বাস্থ্যসেবা (এমএনএইচ) উন্নত করার জন্য সরকার ইতোমধ্যে ডাক্তার, নার্স, কমিউনিটি স্বাস্থ্যসেবা সরবরাহকারী এবং ধাত্রী নিয়োগ দিয়েছে। ভবিষ্যতে পারিবারিক কল্যাণ সেবা নিশ্চিতকরণে বিপুল সংখ্যক পরিবার কল্যাণ সহকারী এবং পরিবার কল্যাণ পরিদর্শনকারী নিয়োগ দেওয়া হবে। তাছাড়া, তুলনামূলক দুর্গম এলাকা এবং পিছিয়ে পড়া এলাকায় পরিবার পরিকল্পনা পরিষেবাসমূহ পৌছানোর জন্য যথেষ্ট কর্মী সরবরাহ করা হবে।

ইতোমধ্যে কিশোর স্বাস্থ্যসেবা জাতীয় পরিকল্পনা (২০১৭-৩০) অনুমোদিত হয়েছে এবং এই লক্ষ্যে জাতীয় কর্মসূচী তৈরি করা হয়েছে। কিশোরী নারী এবং সদ্য বিবাহিত দম্পতিদের মধ্যে পরিবার পরিকল্পনা সেবার চাহিদা তৈরি করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। তৈরি পোশাক খাতের শ্রমিকসহ সকলের জন্য পরিবার পরিকল্পনা সেবা নিশ্চিত করতেও নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

এসডিজি ৪: সকলের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সমতাভিত্তিক গুণগত শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং জীবনব্যাপী শিক্ষালাভের সুযোগ সৃষ্টি

গত এক দশকের বেশি সময় ধরে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে জেন্ডার সমতাসূচকের (জিপিআই) মান রয়েছে ১-এর বেশি। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে অর্থাৎ টারশিয়ারি শিক্ষায় জিপিআই ২০১৬ সালে ছিল ০.৭১। ২০১৩ থেকে প্রাক-প্রাথমিক স্তরে প্রতিবছর মোট অন্তর্ভুক্তি অনুপাত ১.৪৫ শতাংশ হারে বেড়েছে।

শিক্ষার মান এবং শিক্ষাখাতে সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন নীতিমালা ও কর্মসূচি গ্রহণ অব্যাহত রেখেছে। এসবের মূল লক্ষ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণে প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি, বৈষম্য হ্রাস করা, শিক্ষার মান এবং প্রাসঙ্গিকতা উন্নীতকরণ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জ্ঞান এবং উদ্ভাবনী দক্ষতা বাড়ানো। তবে শিক্ষাখাতে সরকারের নেয়া প্রচেষ্টার সফল অগ্রগতি সত্ত্বেও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং সমতাভিত্তিক শিক্ষা, প্রত্যেক স্তরে শিক্ষার গুণগতমান বৃদ্ধি, শিক্ষা প্রদানে উৎকর্ষ, বয়স্ক স্বাক্ষরতা এবং জীবনব্যাপী শিক্ষার মত বিদ্যমান চ্যালেঞ্জগুলো উপেক্ষা করবার মতো নয়।

৪.১ এসডিজি-৪ এ বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন

৪.১.১ ন্যূনতম পাঠ এবং গণিতে দক্ষতা অর্জনে জেন্ডারভেদে শিশু ও যুবসমাজের অনুপাত

লার্নিং এ্যাসেসমেন্ট অব সেকোন্ডারি ইনস্টিটিউশনস, ২০১৫ এর তথ্যমতে নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ে ৫৪ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রী বাংলা পড়ার ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন করে; যার মধ্যে ৫৫ শতাংশ ছেলে এবং ৫৪ শতাংশ মেয়ে। ইংরেজির ক্ষেত্রে এই হার মাত্র ১৯ শতাংশ, যার মধ্যে ২২ শতাংশ ছেলে এবং ১৮ শতাংশ মেয়ে। আশঙ্কার কথা হলো, ছাত্র-ছাত্রীদের খুব অল্প অংশই এ দেশের দ্বিতীয় প্রধান ভাষা ইংরেজিতে দক্ষতা অর্জন করতে পেরেছে। একই বছরের হিসাব মতে গণিতে সর্বনিম্ন দক্ষতা রয়েছে ৫৭ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীর, যার মধ্যে ৬২ শতাংশ ছেলে এবং ৫২ শতাংশ মেয়ে। ইংরেজি ভাষায় দক্ষতা বাড়ানোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

৪.২.১ অনুর্ধ্ব-৫ বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত যারা স্বাস্থ্য, শেখার এবং মনোবৈজ্ঞানিক কল্যাণে বিকাশের পথে রয়েছে (জেন্ডারভেদে)

এমআইসিএস ২০১৯ অনুযায়ী, ৩৬-৫৯ মাস বয়সী শিশু যারা বিকাশের পথে সঠিক ট্র্যাকে রয়েছে (নিম্নলিখিত চারটি ক্ষেত্রের মধ্যে কমপক্ষে তিনটিতে: সাক্ষরতা-অক্ষরজ্ঞান, শারীরিক, সামাজিক-সংবেদনশীল এবং শিক্ষণ) তাদের অনুপাত হলো ৭৪.৫ শতাংশ যা ২০১২-১৩ সালে ছিল ৬৩.৯ শতাংশ।

৪.২.২ সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশযোগ্য বয়সের এক বছর আগে)

স্কুল কেন্দ্রিক প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টি 'জাতীয় শিক্ষা নীতি ২০১০'-এ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। সংগঠিত শিক্ষায় (প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশযোগ্য

বয়সের এক বছর আগে) অংশগ্রহণের হার বাড়ানোর ক্ষেত্রে বাংলাদেশ কিছুটা অগ্রগতি লাভ করেছে। এছাড়া, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষায় অংশগ্রহণের প্রবণতাও বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ৪.১: মোট অন্তর্ভুক্তিমূলক অনুপাত, প্রাক-প্রাথমিক, ২০০০-২০১৬

	২০১৫	২০১৬
জেন্ডারভেদে সংগঠিত শিক্ষায় অংশগ্রহণের হার (প্রাতিষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষায় প্রবেশযোগ্য বয়সের এক বছর আগে)	ছেলে :৩১ মেয়ে :৩১.৫	ছেলে : ৩৩.৭ মেয়ে : ৩৪.৯

উৎস: ডব্লিউডিআই, ২০১৬

৪.৫.১ শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা সূচক

নতুন শতাব্দীর শুরুতে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষা স্তরে জিপিআই '১' ছাড়িয়ে গেছে এবং বার্ষিক কিছু ওঠা-নামা সত্ত্বেও '১' এর ওপরেই রয়ে গেছে। টারশিয়ারি বা উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন শতাব্দীর শুরুতে ১৯৯০ সালের চেয়ে জিপিআই প্রায় তিনগুণ বেড়েছে। এত উন্নতি সত্ত্বেও ২০১৫ সাল পর্যন্ত এই স্তরের শিক্ষায় জিপিআই এখনো '১' এর নিচেই রয়ে গেছে।

সারণি ৪.২ শিক্ষা ক্ষেত্রে জেন্ডার সমতা সূচক, ২০০৫-২০১৭

শিক্ষার স্তর	২০০৫	২০১১	২০১৩	২০১৫	২০১৬	২০১৭
প্রাইমারী	১.০৪৬	১.০৫৯	১.০৪৪	১.০৮	১.০৬	১.০৭
মাধ্যমিক	১.০৬৬	১.১৫২	১.০৮৩	১.১২৯	১.১০৫	১.১৭
উচ্চ মাধ্যমিক	০.৫২১	০.৬৯৩	০.৭৩৭ (২০১৪)	ঘঅ	০.৭০১	০.৭০
কারিগরি	০.৩৫০	০.২৯৭ (২০১০)	০.৩৯৪	০.৩১৫	০.৩১৫	প্রাপ্ত নয়

উৎস: ডব্লিউডিআই, বিশ্বব্যাংক

৪.৬.১ জেন্ডারভেদে ব্যবহারিক (ক) স্বাক্ষরতা ও (খ) জ্ঞান-দক্ষতায় ন্যূনতম একটি নির্দিষ্ট মানের নৈপুণ্য অর্জনকারী একটি নির্দিষ্ট বয়সের জনগোষ্ঠীর শতকরা হার

গত দশকে প্রাপ্ত বয়স্কদের স্বাক্ষরতার হারে প্রবৃদ্ধি লক্ষ্য করা গেছে। ২০০০ সালে এই স্বাক্ষরতার হার ছিল ৫২ শতাংশের কাছাকাছি। ২০১৭ সালে প্রাপ্ত বয়স্কদের স্বাক্ষরতার হার ক্রমবর্ধমানভাবে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭২.৯ শতাংশে, যার মধ্যে ৭৫.৭ শতাংশ ছেলে এবং ৭০.১ শতাংশ মেয়ে।

৪.গ.১ সংশ্লিষ্ট পর্যায়ে শিক্ষকতার জন্য ন্যূনতম শিক্ষক প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন এমন শিক্ষকদের অনুপাত

বর্তমানে প্রাপ্ত ও ব্যবহৃত তথ্যগুলো শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকদের মধ্যে যারা ডিপিইডি/সি-ইন-এড শিক্ষক প্রশিক্ষণ পেয়েছেন তাদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। প্রাথমিক স্কুল শিক্ষকদের অনুপাতে ২০১৮ সালে সি-ইন-এড ডিগ্রি বেড়ে দাঁড়ায় মোট শিক্ষকদের ৯৪.৩ শতাংশে, আগের বছর ২০১৫ সালে যে হার ছিল ৮২ শতাংশ।

সারণি ৪.৩: প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সি-ইন-এড (%)

	২০১৫	২০১৮
সি-ইন-এড শিক্ষকদের (%)	মোটঃ ৮২ পুরুষঃ ৮০ মহিলাঃ ৮৬	মোটঃ ৯৪.৩ পুরুষঃ ৯৪.৮ মহিলাঃ ৯৪.১

সূত্র: প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রনালয়, ২০১৮

৪.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

বিভিন্ন স্তরে শিক্ষার্থী ভর্তির হার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে, যদিও সকলের জন্য জীবনব্যাপী সমতাপূর্ণ ও ন্যায়সঙ্গত মানের শিক্ষা সুযোগ তৈরিতে এখনো যথেষ্ট চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। প্রাথমিক স্তর থেকে শুরু করে শিক্ষার সকল স্তরে গুণগত মান একটি প্রধান উদ্বেগের বিষয়। বলাই বাহুল্য, দক্ষ শ্রমবাজারের চাহিদা মেটানোর জন্য উচ্চশিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মান এবং প্রাসঙ্গিকতা বেশ অপর্যাপ্ত।

৪.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

প্রাথমিক ও মাধ্যমিক শিক্ষার মূল দৃষ্টিপাত হবে: (ক) বিভিন্ন সামাজিক-অর্থনৈতিক গোষ্ঠী, অঞ্চল, জাতি এবং স্বাস্থ্যগত অবস্থানের সকল স্কুল বয়সী শিশুদের জন্য স্কুলে উপস্থিতি নিশ্চিত করণ; (খ) স্কুলে ধরে রাখা এবং (গ) যথাযথ পাঠ্যক্রম, শিক্ষাদানের দক্ষতা, দক্ষ শিক্ষক নির্বাচন, চাকুরীর পূর্বে প্রশিক্ষণ, পেশাগত উন্নয়ন ও মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রমকে উন্নতকরণ।

তৃতীয় স্তরের (টারশিয়ারি) শিক্ষার মান ও প্রাসঙ্গিকতা বৃদ্ধি করতে হবে। এজন্য শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন: (ক) বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর অবকাঠামোগত উন্নয়ন; (খ) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর আরো বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা; (গ) মান উন্নয়নে পাঠ্যক্রম হালনাগাদ করা; (ঘ) বিশিষ্ট শিক্ষাবিদগণের নেতৃত্বে উচ্চশিক্ষা খাতে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (ইউজিসি) পুর্নগঠন; (ঙ) পাঠ্যক্রম নকশায় বিশেষজ্ঞ, চাকুরীদাতা এবং বিশেষজ্ঞ প্রাক্তন ছাত্রদের অন্তর্ভুক্তি; (চ) গবেষণা ও উন্নয়ন অংশীদারিত্ব, অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং ইন্টার্নশিপসহ নানা উদ্যোগে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে একটি কার্যকর শিক্ষা- শিল্প সংযোগ স্থাপন; (ছ) গুণগত মান নিশ্চয়তা পদ্ধতি বাস্তবায়ন; (জ) কর্মক্ষমতা মূল্যায়নের মাধ্যমে পদোন্নতি পদ্ধতি তৈরি; এবং (ঝ) টিভিইটি খাতে দক্ষতার মাপকাঠিতে মূল্যায়ন ব্যবস্থা চালু করা।

সংসদে মহিলা সদস্যের অনুপাত সময়ের সাথে সাথে ধীর গতিতে হলেও বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯ সালে ২০.৮৮ শতাংশে পৌঁছেছে। যদিও ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী মহিলা এবং মেয়েরা তাদের বর্তমান বা প্রাক্তন ঘনিষ্ঠ সংঙ্গী এবং সেইসাথে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী নয় এমন ব্যক্তিদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হচ্ছে তার পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে, তবুও তারা তাদের ঘনিষ্ঠ সঙ্গীদের দ্বারা সহিংসতার জন্য উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ২০১৫ সালে, ১৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী ২.৫% নারী ও মেয়ে পূর্ববর্তী ১২ মাসে ঘনিষ্ঠ সঙ্গী ছাড়া অন্য ব্যক্তির যৌন সহিংসতার শিকার হয়েছিল। পুরুষদের তুলনায় মহিলারা পরিবারে অবৈতনিক গৃহস্থালি ও পরিচর্যা কাজের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ সম্পাদন করে।

৫.১ এসডিজি-৫ এ বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন

৫.৩.১ ১৫ বছর এবং ১৮ বছর বয়সের পূর্বে বিবাহ বা কোন প্রকার বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে এমন ২০-২৪ বছর বয়সী মহিলাদের অনুপাত

২০১২-১৩ সালের তুলনায় ২০১৯ সালে বাল্যবিবাহের অবস্থার উন্নতি হয়েছে। ১৫ বছরের বয়সের পূর্বে বাল্যবিবাহের হার ২০১২-১৩ সালে ১৮.১ শতাংশের তুলনায় ২০১৯ সালে হ্রাস পেয়ে ১৫.৫ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে।

সারণী ৫.১: বাল্য বিবাহের শতকরা হার

২০-২৪ বছর বয়সী মহিলাদের বিবাহ বা কোন প্রকার বন্ধনে আবদ্ধের অনুপাত	২০১২-১৩	২০১৯
১৫ বছর বয়সের পূর্বে	১৮.১	১৫.৫
১৮ বছর বয়সের পূর্বে	৫২.৩	৫১.৪

উৎস: বাংলাদেশ মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (এমআইসিএস), বিবিএস, বিভিন্ন বছরের

৫.৫.১ (ক) জাতীয় সংসদ ও (খ) স্থানীয় সরকারে নির্বাচিত নারী আসনের অনুপাত

জাতীয় সংসদ ও স্থানীয় সরকারে প্রভাবশালী নারী নেতৃত্বের দেশ হিসেবে বাংলাদেশ একটি উদাহরণ। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় সংসদের স্পিকার, বিরোধীদলীয় নেতা এবং সংসদ উপ-নেতা সকলেই নারী।

সারণী ৫.২: সংসদে মহিলা সদস্যদের অনুপাত, ২০০১-২০১৯

	২০০১	২০০৮	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৯
মহিলা সদস্য সংখ্যা	৪১	৬৪	৭০	৭১	৭১	৭২	৭৩
মোট আসন সংখ্যা	৩৩০	৩৪৫	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০	৩৫০
শতকরা হার	১২.৪২	১৮.৫৫	২০.০০	২০.২৯	২০.২৯	২০.৫৭	২০.৮৮

উৎস: বাংলাদেশ সংসদ সচিবালয় ২০১৯

এই দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, নারী ক্ষমতায়ন পরিস্থিতি এবং জেন্ডার সমতা আশাব্যঞ্জক বলে মনে হয়। তবে নব্বইয়ের দশকের গোড়ার দিকে জাতীয় সংসদে নারীদের ব্যাপক অংশগ্রহণে বেশ সীমাবদ্ধতা ছিল । তা স্বত্ত্বেও কম হলেও এটা লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, ২০১৯ সালে সংসদে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল ২০.৮ শতাংশ, ১৯৯১ সালে এই হার ছিল ১২.৭৩ শতাংশ। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের অংশ ৪৫ থেকে বেড়ে ৫০ এ উন্নীত হয়েছে। তবে, বর্তমানে সংসদে ২৩ জন মহিলা সংসদ সদস্য সরাসরি নির্বাচিত হয়েছেন যা আগের যে কোন সময়ের চেয়ে সর্বোচ্চ।

স্থানীয় সরকারে, নারীর অধীনে থাকা আসনের অনুপাত ২০১৬ সালের ২০.০০ শতাংশের তুলনায় বেড়ে ২০১৮ সালে ২৫.৬১ শতাংশ হয়েছে । আইনসভা, বিচার বিভাগ এবং সরকারের নির্বাহী বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগ্রহণকারী পদে নারীদের অধিকতর অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

এটা অত্যন্ত উৎসাহজনক যে বাংলাদেশ দক্ষিণ এশিয়ার প্রতিবেশীদের তুলনায় নারীর ক্ষমতায়নে উল্লেখযোগ্যভাবে আরও ভাল পারফরম্যান্স ইঙ্গিত করে ০.৭২১ স্কোর অর্জন সহ দেশগুলির বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ৪৮ তম স্থানে রয়েছে।

সারণী ৫.৩: দক্ষিণ এশিয়ার মহিলা ক্ষমতায়নের তুলনামূলক চিত্র

মোট	বাংলাদেশ	মালদ্বীপ	ইন্ডিয়া	শ্রিলংকা	নেপাল	ভূটান	পাকিস্তান
র‍্যাংকিং	৪৮	১১৩	১০৮	১০০	১০৫	১২২	১৪৮
স্কোর	০.৭২১	০.৬৬২	০.৬৬৫	০.৬৭৬	০.৬৭১	০.৬৩৮	০.৫৫০

উৎস: ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম, গ্লোবাল জেন্ডার গ্যাপ রিপোর্ট ২০১৮

৫.খ.১ জেন্ডার ভেদে মোবাইল ফোনের মালিকানা রয়েছে এমন ব্যক্তিবর্গের অনুপাত

ডিজিটালাইজেশনে সরকারের মনোনিবেশের ফলস্বরূপ, দেশে প্রযুক্তি অভিমুখীতা বিকাশ লাভ করছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো মোবাইল ফোন ব্যবহার যা প্রত্যন্ত অঞ্চলে সংযোগ বাড়ানোর ক্ষেত্রে অবদান রাখে। ২০১৮ সালে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা লোকদের অনুপাত বাংলাদেশে ৭৮.১ শতাংশ, যার মধ্যে ৮৩.৪ শতাংশ পুরুষ এবং ৭২.৩৪ শতাংশ মহিলা মোবাইল ফোন ব্যবহার করছিলেন [সিটিজেন পার্সেপশন হাউসহোল্ড সার্ভে (সিপিএইচএস) ২০১৮]।

৫.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

দেশে জেন্ডার সমতা অর্জনের মূল চ্যালেঞ্জগুলির মধ্যে কয়েকটি হলো: মহিলাদের বিরুদ্ধে সহিংসতা দূরীকরণ, বাল্য বিবাহ রোধ এবং বিদ্যমান জেন্ডার ডিজিটাল বিভাজনকে মোকাবেলা করা।

যেহেতু সহিংসতা একাধিক উৎস থেকে উদ্ভূত হয়েছে এবং এর একাধিক কারণ রয়েছে তাই এটা নির্মূলের জন্য বহুবিধ কার্যক্রম প্রয়োজন। বাংলাদেশ সরকার অনেক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, কিন্তু সমস্যার বিস্তৃতি এবং জটিলতার তুলনায় তা অপ্রতুল মনে হতে পারে।

বাল্যবিবাহ রোধে সরকারের সুনির্দিষ্ট প্রচেষ্টা এবং মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার সাধারণ উন্নতির কারণে ১৮ বছরের কম বয়সী মেয়েদের বিবাহের অনুপাত হ্রাস পাচ্ছে। এখনও উন্নতির যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

জেন্ডার ডিজিটাল বিভাজন এখনও একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ, তার সাথে মহিলারা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) গ্রহণের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে, যা তাদের শিক্ষামূলক এবং কর্মসংস্থানের সুযোগগুলিকে প্রভাবিত করছে।

৫.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

জেন্ডার বৈষম্য বিষয়টি সমাধানের জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জেন্ডার বৈষম্য মোকাবেলায় সরকারের প্রচেষ্টাগুলো হলো- বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন উদ্যোগে অংশ নেওয়া, নীতিমালা ও আইনী সহায়তা, নারীর মানবিক সক্ষমতা উন্নত করা, তাদের অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি, মহিলাদের অগ্রগতির ক্ষেত্রে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি এবং জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট বাস্তবায়ন করা।

বাল্যবিবাহের পিছনে যে বিষয়গুলি যেমন দারিদ্র্য, শিক্ষার অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ এবং জলবায়ু পরিবর্তন, জেন্ডার বৈষম্য, হয়রানি ও হুমকি এবং সামাজিক চাপের বিষয় বিবেচনা করে সেগুলি মোকাবেলায় বাংলাদেশ আইন, নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ অব্যাহত রাখবে।

কর্মক্ষেত্র এবং লোকালয়ে নারীদের জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিতকরণ: কর্মক্ষেত্রে এবং সকল জনপদে VAW এর বিরুদ্ধে জনমত গড়ে তোলা প্রয়োজন এবং অবশেষে এই জাতীয় অপরাধমূলক ক্রিয়াকলাপকে নিরুৎসাহিত ও নির্মূল করতে হবে।

এসডিজি ৬: সকলের জন্য পানি ও স্যানিটেশনের টেকসই ব্যবস্থাপনা এবং প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা

এমডিজির লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য সর্বজনস্বীকৃত। এই স্বীকৃতির অংশ হিসাবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এসডিজি -৬ এর জন্য এইচএলপিডব্লিউ এর সদস্য করা হয়েছিল। এই সদস্যপদটি এসডিজি -৬ এ অনেক কার্যক্রমকে প্রভাবিত করেছে এবং পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করেছে। ২০১৫ সালে ৮৭ শতাংশ জনগণ নিরাপদ পানির (লক্ষ্যমাত্রা ৬.১) এবং ৬১ শতাংশ জনগণ নিরাপদ পয়:নিষ্কাশনের (লক্ষ্যমাত্রা ৬.২) সুবিধার সুযোগ পেয়েছে। পানি সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য, লক্ষ্যমাত্রা ৬.৩ (পানির মানের উন্নতি) এবং লক্ষ্যমাত্রা ৬.৬ (পানির বাস্তুতন্ত্র সুরক্ষা) সম্পর্কিত দুটি মূল উদ্যোগ লক্ষ্য করা যায়।

৬.১ এসডিজি-৬ এ বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন

৬.১.১ নিরাপদ খাবার পানির সুবিধাভোগী জনসংখ্যার অনুপাত

আর্সেনিক দূষণ কমানোর কারণে নিরাপদ খাবার পানি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার পরিমাণ ৮৭ শতাংশ (২০১৫ সালে) দাঁড়িয়েছে। উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সত্ত্বেও, এসডিজি যুগের শুরুতে, দক্ষিণ-এশিয়ার দেশগুলির মধ্যে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সর্বনিম্ন পানি সরবরাহ সুবিধাদানের আওতায় রয়েছে।

৬.২.১ সাবান ও পানি দিয়ে হাত ধোয়ার সুবিধা সহ নিরাপদ ব্যবস্থাপনার স্যানিটেশন সেবা ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত

২০১৫ সালে ডব্লিউএইচও / ইউনিসেফের জয়েন্ট মনিটরিং প্রোগ্রাম ফর ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন (জেএমপি) এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ লোক খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে, জনসংখ্যার ১০ শতাংশ লোক অনুন্নত ল্যাট্রিন ব্যবহার করছেন, ২৮ শতাংশ জনসংখ্যা ভাগাভাগি করে অন্যদের সাথে ল্যাট্রিন ব্যবহার করছেন এবং জনসংখ্যার ৬১ শতাংশ উন্নত ল্যাট্রিন ব্যবহার করছে (ইউনিসেফ এবং ডব্লিউএইচও, ২০১৫)। উপাত্তগুলোর ভিত্তি বছর ২০১৫ সালের পরিসংখ্যান। পরবর্তী বছরগুলির উপাত্ত এখনও পাওয়া যায়নি।

৬.ক.১ সরকারের সমন্বিত ব্যয় পরিকল্পনার অংশ হিসেবে পানি ও স্যানিটেশন সংশ্লিষ্ট সরকারি উন্নয়ন সহায়তার পরিমাণ

পানি এবং স্যানিটেশন সম্পর্কিত সরকারী উন্নয়ন সহায়তার (ওডিএ) পরিমাণ উর্ধ্বমুখী প্রবণতা অনুসরণ করছে। ২০১৪-১৫ অর্থবছরে পানি এবং স্যানিটেশন সম্পর্কিত ওডিএর পরিমাণ ছিল ৩০১.১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। ২০১৭-১৮ অর্থবছরে এর পরিমাণ বেড়েছে ৪৯৬.৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে।

৬.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

মূল চ্যালেঞ্জ হ'ল পানি এবং স্যানিটেশনের পরিধি বাড়ানো; বিশেষ করে দূর্গম অঞ্চলে। যেহেতু বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে পানি সরবরাহে নিয়োজিত রয়েছে, অভীষ্ট-৬ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সমস্ত বাস্তবায়নকারী সংস্থার মধ্যে সমন্বয় থাকা প্রয়োজন। অভীষ্ট ৬ এর আর একটি বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে তথ্যের অভাব। এসডিজি ৬-এর অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ডেটা প্রস্তুতের উদ্যোগ নেওয়া দরকার।

৬.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

বাংলাদেশ সরকার স্কুলগুলির জন্য বিশেষ করে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে একটি স্ট্যান্ডার্ড ওয়াশ (WASH) কার্যক্রম নির্ধারণ করেছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই) যে মাইলফলক কর্মসূচি গ্রহণ করেছে সেগুলির মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন (পিইডি) প্রোগ্রামটি বালক ও বালিকাদের জন্য পানি সরবরাহের সাথে পৃথক টয়লেট সুবিধার ব্যবস্থা নিয়ে ওয়াশ ব্লক নামে উদ্ভাবনী কার্যক্রম শুরু করেছে। ডিপিই এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে এবং জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদফতর (ডিপিএইচই), পানি সরবরাহ এবং স্যানিটেশন সম্পর্কিত শীর্ষস্থানীয় সংস্থা সহ-বাস্তবায়নকারী হিসাবে কাজ করছে।

সেন্টার ফর এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিসেস (সিইজিআইএস) কে অভীষ্ট-৬ সম্পর্কিত পুরো কার্যক্রমের জন্য বুদ্ধিগত এবং লজিস্টিকাল সহায়তার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছিল। পানি এবং স্যানিটেশন সম্পর্কিত লক্ষ্যটির দুটি বাস্তবায়ন ব্যবস্থার পাশাপাশি ছয়টি পৃথক লক্ষ্যমাত্রার জন্য কর্ম পরিকল্পনা প্রস্তুত করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল।

এসডিজি ৭: সকলের জন্য সাশ্রয়ী, নির্ভরযোগ্য, টেকসই ও আধুনিক জ্বালানি সহজলভ্য করা

এটা লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশ ২০২৫ সালের স্থিরকৃত সময়ের আগেই শতভাগ পরিবারের বিদ্যুৎ ব্যবহারের সুযোগের দিকে দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে চলছে; ২০১৯ সালে এটি ৯২.২ শতাংশে পৌঁছেছে। ২০১৯ সালে রান্না করার জন্য পরিচ্ছন্ন জ্বালানী এবং প্রযুক্তি ব্যবহারের অভিগম্যতায় জনসংখ্যার অনুপাত ১৯.০ শতাংশে দাড়িয়েছে। নবায়নযোগ্য জ্বালানীর ধীর বৃদ্ধি এবং অ-নবায়নযোগ্য জ্বালানীর দ্রুত বৃদ্ধির সম্মিলিত প্রভাব হলো মোট জ্বালানী শক্তি ব্যয়ে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর অংশ কম হওয়ার মূল কারণ। দেশে জ্বালানী শক্তির দক্ষতা ধীরে ধীরে উন্নতি হচ্ছে।

৭.১ এসডিজি-৭ এ বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন

৭.১.১ বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় জনসংখ্যার অনুপাত (%)

২০১৮-১৯ সালে বিদ্যুত সুবিধার আওতায় জনসংখ্যার অনুপাত ২০১০ সালের ৫৫.২৬ শতাংশ থেকে বেড়ে ৯২.২ শতাংশ হয়েছে। অভ্যন্তরীণ উৎপাদন এবং আমদানির মাধ্যমে বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়াতে সরকারের অদম্য প্রচেষ্টার কারণে ২০১০ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে প্রায় ২০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং পরবর্তী বছরে প্রায় দশ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল ।

সারণী ৭.১: বিদ্যুতের সুবিধার আওতায় জনসংখ্যার অনুপাত (শতাংশ)

	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬	২০১৯*
জাতীয়	৩১.২	৪৪.২৩	৫৫.২৬	৭৫.৯২	৯২.২
শহর	৮০.৪	৮২.৬১	৯০.১০	৯৪.০১	৯৭.৮
গ্রাম	১৮.৭	৩১.১৯	৪২.৪৯	৬৮.৮৫	৯০.৭

উৎস: বিবিএস, এইচআইইএস, বিভিন্ন বছর; ২০১৮-১৯ এর ডেটা বিদ্যুৎ বিভাগ থেকে নেয়া হয়েছে

* বাংলাদেশ মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার সার্ভে (এমআইসিএস) ২০১৯, বিবিএস

৭.১.২ পরিচ্ছন্ন জ্বালানী এবং প্রযুক্তির উপর প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত (%)

২০০০-২০০৫ সময়কালে পরিচ্ছন্ন জ্বালানী এবং প্রযুক্তিতে প্রাথমিকভাবে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত প্রতি বছর ০.৬৩ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬ সালে, নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত ২০১৫ সালের থেকে ১.০৪ শতাংশ হারে বেড়েছে। পরিচ্ছন্ন জ্বালানী এবং প্রযুক্তির উপর নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাতের এই প্রবণতা যদি ধরে রাখা যায়, তবে ২০২০ সালে এটি ২০.৯৩ শতাংশে পৌঁছে যাবে যা তারপরেও লক্ষ্যমাত্রার নিচে থাকবে।

সারণী ৭.২ রান্নায় পরিচ্ছন্ন জ্বালানী এবং প্রযুক্তিতে নির্ভরশীল জনসংখ্যার অনুপাত (শতাংশ)

২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৫	২০১৬	২০১৯*
৭.২৪	৯.৭৪	১২.৯	১৬.৬৮	১৭.৭২	১৯.০

উৎস: বিশ্ব উন্নয়ন সূচক, বিশ্বব্যাংক

** বাংলাদেশ একাধিক সূচক ক্লাস্টার জরিপ (এমআইসিএস) ২০১৯*

৭.২.১ মোট জ্বালানী ব্যবহারে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর অংশ

মোট জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য জ্বালানী উৎসের ভাগ ২০১৫ সালে (ভিত্তি বছর) ২.৭৯ শতাংশ প্রক্ষেপন করা হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে নবায়নযোগ্য উৎস থেকে মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের দশ শতাংশ উৎপাদন করার পরিকল্পনা নিয়েছে বাংলাদেশ। দুটি পারস্পারিক সম্পর্কের কারণে এই লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন হবে বলে মনে হচ্ছে। একদিকে নবায়নযোগ্য জ্বালানীর সরবরাহ ধীর হারে বাড়ছে এবং অপরদিকে অনবায়নযোগ্য উৎস থেকে বিদ্যুতের সরবরাহ অনেক দ্রুত হারে বাড়ছে।

সারণী ৭.৩ মোট জ্বালানী ব্যবহারের ক্ষেত্রে নবায়নযোগ্য শক্তির অংশ (শতাংশ)

২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
২.৭৯	২.৮৫	২.৮৭	২.৮৯

উৎস: শ্রেডা, ২০১৮

৭.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট ৭ অর্জনে বাংলাদেশ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে। বিদ্যমান শিল্প, বাণিজ্য, পরিবারের চাহিদা এবং ভবিষ্যতের উত্থিত চাহিদা মেটাতে দ্রুত হারে বিদ্যুতের সরবরাহ বাড়ানো দরকার। প্রাক-মিটারিংয়ের মাধ্যমে শিল্প খাতে (উদাহরণস্বরূপ ব্রয়লার থেকে নিঃসৃত গ্যাস ব্যবহারের জন্য সহ-উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং ইতোমধ্যে পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে) এবং গৃহস্থালী খাতে জ্বালানী দক্ষতার বিষয়টিকে বিবেচনায় নেয়া দরকার।

এলএনজি আমদানি বাংলাদেশকে আন্তর্জাতিক গ্যাসের আন্তজার্তিক বাণিজ্য মূল্যের মুখোমুখি করেছে। যার ফলশ্রুতি বিভিন্ন রকম হতে পারে। বাংলাদেশের গ্যাসের শুল্কের গড় ওজন প্রতি গিগাজুলের ১.৭ মার্কিন ডলার থেকে কমপক্ষে ৩.১ মার্কিন ডলারে লাফিয়ে উঠবে বলে অনুমান করা হয়। এই মূল্যবৃদ্ধি শিল্পের প্রতিযোগিতাকে প্রভাবিত করে শিল্প খাতে উৎপাদন ব্যয়কে বাড়িয়ে তুলবে।

কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্পের উপর জোর দেওয়ার জন্য প্রাক্কলিত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে বছরে ৬০০ কোটি টন কয়লা লাগবে। এই বিশাল কয়লা পরিচালনা করতে বন্দর, রেল পরিবহন এবং কয়লা মজুতের অবকাঠামো সহ বিশাল অবকাঠামো নির্মাণ করা একটি

চ্যালেঞ্জ। জ্বালানী মূল্য (বিদ্যুৎ, কাঠ এবং গ্যাস) এবং ভর্তুকি অর্থনীতিতে একটি চ্যালেঞ্জ নিয়ে আসে। বিদ্যুৎ খাতের ভর্তুকি দেশের বার্ষিক জিডিপির ২-৩ শতাংশ। ভবিষ্যতে কয়লাভিত্তিক প্রকল্পগুলি কার্যকর হওয়ায় তা বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত টেকসই হওয়া বিষয়টি কিছুটা প্রভাবিত হতে পারে।

৭.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

সরকার জাতীয় বিদ্যুৎ গ্রিডে অত্যন্ত দক্ষ বিদ্যুৎকেন্দ্র চালু করছে। সিংগেল সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্র সমূহের মধ্যে উপযুক্ত গুলিকে কম্বাইন্ড সাইকেল বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আপগ্রেড করা হচ্ছে। উচ্চ দক্ষতা সম্পন্ন মেশিনের সাহায্যে কিছু পুরানো বিদ্যুৎকেন্দ্রের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য তাদের পুনঃনির্মাণ প্রক্রিয়াধীনে রয়েছে। আসন্ন সমস্ত কয়লা বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলিতে পরিবেশের উপর প্রভাব কমাতে অতি-কৃত্রিম প্রযুক্তি, ফ্লু গ্যাসের গন্ধহীনতা এবং ইলেক্ট্রোস্ট্যাটিক প্রিসিপেটর দ্বারা সজ্জিত করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে প্রমাণিত ও সর্বশেষ প্রযুক্তি গ্রহণের ফলে বিদ্যুৎ খাতে দক্ষতা অর্জনে সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হবে।

গ্যাসের চাহিদা মেটাতে সরকার তরল প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) আমদানির পরিকল্পনা করছে। এই উদ্দেশ্যে, ভাসমান স্টোরেজ রি-গ্যাসিফিকেশন ইউনিট (এফএসআরইউ) নির্মাণাধীন রয়েছে।

নবায়নযোগ্য জ্বালানির বিকাশের জন্য সরকার নবায়নযোগ্য জ্বালানি-ভিত্তিক জেনারেশন সুবিধা বাস্তবায়নের জন্য বেসরকারী খাতকে প্রণোদনা দিচ্ছে। এনজিও এবং বেসরকারী সংস্থাগুলি গ্রামীণ অঞ্চলে সোলার হোম সিস্টেম (এসএইচএস) বাস্তবায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ২৩২.৯৯ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ক্ষমতা সহ দেশে সোলার হোম সিস্টেম ইনস্টলের মোট সংখ্যা ৫.৫ মিলিয়ন (SREDA, ২০১৯)।

এসডিজি ৮: সকলের জন্য পূর্ণাঙ্গ ও উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান এবং শোভন কর্মসুযোগ সৃষ্টি এবং স্থিতিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন

বাংলাদেশ সাম্প্রতিক বছরগুলিতে গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৭ শতাংশেরও বেশি উন্নীত করেছে (অর্থবছর ২০১৫-২০১৮) এবং আগের কয়েক বছরের ৬-৭ শতাংশ হারের তুলনায় গত বছরে ৮ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে। জনসংখ্যার ধীর বৃদ্ধির সাথে মাথাপিছু জিডিপি প্রবৃদ্ধি বাড়ছে এবং ২০২০ সালের লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সঠিক পথে রয়েছে। দীর্ঘসময় ধরে বাংলাদেশে আনুমানিক বেকারত্বের হার ৪ শতাংশের কাছাকাছি আছে এবং অদূর ভবিষ্যতে এটি দীর্ঘমেয়াদী স্তরের কাছাকাছি থাকার পক্ষে যুক্তিসঙ্গতভাবে আশা করা যায়। সাম্প্রতিক জিইডি কর্তৃক প্রকাশিত জরিপে বলা হয়েছে বাংলাদেশে বেকারত্বের হার ৩.১ শতাংশ (২০১৮)।

বর্ধিত অনানুষ্ঠানিকতা যা শোভন কাজ নিশ্চিত করার জন্য সরকারের প্রচেষ্টাকে বাধাগ্রস্থ করছে এবং ১৫-২৯ বছর বয়সী নারী এবং ব্যক্তিদের উচ্চ বেকারত্বের হার বাড়াচ্ছে, সেগুলো ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য মোকাবেলা করা প্রয়োজন।

৮.১ এসডিজি-৮-এ বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন

৮.১.১ মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপি-র বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বাংলাদেশ ঈর্ষনীয় টেকসই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জন করেছে যা জুলাই ২০১৫ সালে নিম্ন থেকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশের মর্যাদায় রুপান্তর করতে এবং মার্চ ২০১৮ সালে প্রথম ত্রৈবার্ষিক বিবেচনায় স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভে সক্ষম করে তুলেছে।

২০১৮ সালে মাথাপিছু জিডিপি-র প্রকৃত প্রবৃদ্ধি ২০১৫ সালের ভিত্তি বছরের তুলনায় ৫.১২ শতাংশ থেকে বেড়ে ৬.৪০ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। মাথাপিছু জিডিপি ২০১১ সালের ৯২৮ মার্কিন ডলার থেকে ২০১৯ সালে ১৯০৯ মার্কিন ডলারে দাড়িয়েছে।

৮.২.১ প্রতি কর্মীজনে প্রকৃত জিডিপির বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার

প্রতি কর্মীজনে প্রকৃত জিডিপির প্রবৃদ্ধি ২০১৫ সালের ৪.৪৯ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০১৮ সালে ৫.৫৬ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ২০১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে ১৫ বছর ও তদুর্ধ্ব বয়সী মানুষের মধ্যে কর্মে নিযুক্ত অথবা অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে নিযুক্ত মানুষের সংখ্যা প্রায় ৬০.৮ মিলিয়ন (মোট জনসংখ্যার প্রায় ৫৫.৮ ভাগ), যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ২.১৮ ভাগ বেশি।

সারণি ৮.১: অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (শতাংশ)

	ভিত্তি বছর ২০১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
মাথাপিছু প্রকৃত জিডিপির বার্ষিক বৃদ্ধির হার	৫.১২	৫.৭৭	৬.০৫	৬.৪০
কর্মজীবী প্রতি মাথাপিছু জিডি-পর বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার	৪.৪৯	৬.২৭	৪.৯৯	৫.৫৬

উৎস: বিবিএস

৮.৩.১ জেন্ডারভেদে অ-কৃষিকাজে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের অনুপাত

সাম্প্রতিক ২০১৬-১৭ সালের শ্রমশক্তি জরিপ অনুসারে, দেশে মোট কর্মসংস্থানে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান হলো প্রায় ৮৫.১ শতাংশ; যার মধ্যে পুরুষ ৮২.১ শতাংশ এবং মহিলা ৯১.৮ শতাংশ শিল্প ও সেবা খাত মিলিয়ে এবং অনানুষ্ঠানিক পর্যায়ে মোট কর্মসংস্থানের ৫৯.৪ শতাংশ অকৃষি খাতে নিয়োজিত। অ-কৃষি খাতে অনানুষ্ঠানিক কর্মসংস্থানের হার ২০১৫ সালের ৭৭.৮ শতাংশ থেকে কিছুটা বেড়ে ২০১৬ সালে ৭৮ শতাংশে পৌঁছেছে।

৮.৫.১ পেশা, বয়স এবং অসমর্থ ব্যক্তি ভেদে (প্রতিবন্ধী) মহিলা ও পুরুষ কর্মীদের ঘন্টাপ্রতি গড় উপার্জন

বিবিএস এর সাম্প্রতিক জরিপ অনুযায়ী, গড় মাসিক মজুরি কিছুটা উন্নত হয়েছে এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছরে তা ১৩৫২৮ টাকা ছিল যা ভিত্তি বছরের ১২৮৯৭ টাকার চেয়ে বেশি, যদিও গত ৪ বছরে নারী ও পুরুষ উভয় শ্রমিকের ক্ষেত্রেই গড় প্রকৃত মজুরি হ্রাস পেয়েছে, যা কর্মক্ষম বয়সের জনগণের মধ্যে বৈষম্যকে বাড়িয়ে তুলতে পারে।

৮.৫.২ জেন্ডার, বয়স এবং অসামর্থতা ভেদে বেকারত্বের হার

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে সামগ্রিক বেকারত্বের পরিস্থিতি প্রান্তিকভাবে উন্নত হয়েছে, যা ২০১০ সালের ৪ শতাংশ থেকে ২০১৮ সালে ৩.১ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মহিলা শ্রমিকরা তাদের সমকক্ষ পুরুষের তুলনায় বেশি বেকারত্ব অনুভব করেছেন। মহিলা বেকারত্বের হার পুরুষ বেকারত্বের হারের চেয়ে তিনগুণ বেশি। পুরুষের বেকারত্বের হার ২০১৬ সালের ৩ শতাংশ থেকে কমে ২০১৮ সালে ১.৭ শতাংশে দাঁড়িয়েছে (জিইডি)।

সারণি ৮.২: বেকারত্বের হার

	২০১০	২০১৬	২০১৮*
পুরুষ	৪.১	৩	১.৭
মহিলা	৫.৮	৬.৮	৬.৯
মোট	৪.৬	৪.২	৩.১

*উৎস: বিবিএস, এলএফএস, বিভিন্ন বছর এবং * জিইডি (সেম্পল হাউজহোল্ড সার্ভে ২০১৯)*

৮.৬.১ শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণের সাথে যুক্ত নয় (এনইইটি) এমন ১৫-২৪ বছর বয়সী যুবদের অনুপাত

ভিত্তি বছরে প্রায় ২৮.৯ শতাংশ যুব (১৫-২৯ বছর বয়সী) শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে যুক্ত ছিলেন না যা পরবর্তী বছরে হ্রাস পেয়ে প্রায় ২৬.৮ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। ২০১৬-১৭ সালে এনইইটিতে যুব পুরুষ এর হার ৯ শতাংশের কাছাকাছি, যদিও যুব মহিলাদের হার প্রায় ৪৪ শতাংশ।

সারণি ৮.৩: শিক্ষা ও কর্মসংস্থানে নেই এমন তরুণ-তরুণীর অনুপাত (এনইইটি)

	ভিত্তি বছর ২০১৫	২০১৬-১৭
শিক্ষা, কর্মসংস্থান বা প্রশিক্ষণে নেই তরুণ-তরুণীর (১৫-২৪ বছর বয়সী) অনুপাত (শতাংশ)	২৮.৯ (গ: ১০.৩, ঋ: ৪৬.৭)	২৬.৮ (গ-৯.২; ঋ-৪৩.৯)

উৎস: বিবিএস, এলএফএস ২০১৫-১৬ এবং ২০১৬-১৭

৮.৭.১ জেন্ডার এবং বয়সভেদে শিশু শ্রমে নিযুক্ত ৫ - ১৭ বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত এবং সংখ্যা

বাংলাদেশ মাল্টিপল ইন্ডিকেটর ক্লাস্টার জরিপ (এমআইসিএস) ২০১৯ হচ্ছে বাংলাদেশে পরিচালিত সবচেয়ে সাম্প্রতিক জরিপ। জরিপে দেখা যায়, ৫-১৭ বছর বয়সী ১০.৮ শতাংশ শিশুকে শ্রমজীবী শিশু হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৮.১ শতাংশ শহরাঞ্চলে এবং ১১.৫ শতাংশ গ্রামীণ অঞ্চলে বাস করে।

৮.৮.১ জেন্ডার এবং অভিবাসীর অবস্থান ভেদে পেশাগত কাজে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন আহত হওয়ার ঘটনার হার

সাম্প্রতিক তথ্যগুলি থেকে দেখা যায়, পেশাগত কারণে কর্মক্ষেত্রে আহত হওয়ার ঘটনা অনেকটাই কমেছে, ২০১৫ সালে কর্মক্ষেত্রে মারাত্মক আহতের সংখ্যা ছিল ৩৮২, যা ২০১৬ সালে কমে ৭৫ এ নেমে এসেছে। অন্যদিকে, মারাত্মক নয় এমন আহতের সংখ্যা ২০১৫ সালে ছিল ২৪৬ যা ২০১৭ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৮৮ জনে।

সারণি ৮.৪: মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন পেশাগত আঘাত

	ভিত্তি বছর ২০১৫	২০১৬	২০১৭
জেন্ডার এবং অভিবাসন ভেদে মারাত্মক এবং মারাত্মক নয় এমন পেশাগত আঘাতের হার (প্রতি বছর)	ক) মারাত্মক ক্ষতি: ৩৮২ (পুরুষ: ৩৬২ মহিলা: ২০) খ) মারাত্মক ক্ষতি নয়: ২৪৬ (পুরুষ:১৭৭; মহিলা: ১৯)	ক) মারাত্মক ক্ষতি: ১০৩ (পুরুষ: ১২৪ মহিলা: ০৮) খ) মারাত্মক ক্ষতি নয়: ৯০ (পুরুষ:৬২; মহিলা: ৩৯)	ক) মারাত্মক ক্ষতি: ৭৫ (পুরুষ: ১০৫ মহিলা:২৭) খ) মারাত্মক ক্ষতি নয়: ৪৮৮ (পুরুষ:২৮৫; মহিলা: ২৪৮)

উৎস: এমওএলই, কারখানা এবং স্থাপনা পরিদর্শন বিভাগ, ২০১৭

৮.১০.১ (ক) প্রতি ১,০০,০০০ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বিপরীতে বাণিজ্যিক ব্যাংক শাখার সংখ্যা এবং (খ) প্রতি ১,০০,০০০ প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের বিপরীতে এটিএম বুথের সংখ্যা

প্রতি ১০০,০০০ প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংখ্যা ২০১৫ সালে ৮.৩৭ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে ৯.৬৮ এ উন্নীত হয়েছে। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এটিএম বুথের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে, ২০১৫ সালের ৬.৭৯ থেকে ২০১৮ সালে ১২.৪১ এ উন্নিত হয়েছে যা অর্থনৈতিক অভিগম্যতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত দেয়।

সারণি ৮.৫: আর্থিক অন্তর্ভুক্তি সূচক

	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮
(ক) প্রতি ১,০০,০০০ প্রাপ্তবয়স্কের জন্য বাণিজ্যিক ব্যাংকের শাখার সংখ্যা এবং	(ক) ৮.৩৭	(ক) ৮.৯৬	(ক) ৯.৬১	(ক) ৯.৬৮
(খ) প্রতি ১,০০,০০০ প্রাপ্তবয়স্কের জন্য স্বয়ংক্রিয় টেলার মেশিনের (এটিএম) সংখ্যা	(খ) ৬.৭৯	(খ) ৯.৫৮	(খ) ৯.১৯	(খ) ১২.৪১

উৎস: বাংলাদেশ ব্যাংক, ২০১৮

৮.ক.১ বাণিজ্য সহায়তার প্রতিশ্রুতি ও বিতরণকৃত মোট সহায়তার পরিমাণ

বাংলাদেশ ২০১০-১৭ সালে অঙ্গীকারকৃত ১৫৬৭০.৬৯ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বপিরীতে ৭৬১৭.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বাণিজ্য সহযোগীতা লাভ করে যা থেকে অঙ্গীকার এবং প্রাপ্তির মধ্যে পার্থক্যটা বোঝা যায়। প্রতিশ্রুতি এবং প্রাপ্তির মধ্যে পার্থক্য ২০১৫-১৭ সময়কালে দ্বিগুণ ছিল। বাণিজ্যের জন্য সহায়তা অর্থ বাণিজ্য সম্পর্কিত সংস্থাগুলির উন্নতির জন্য সরবরাহ করা হয়।

৮.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

স্কুলে নতুন করে আগতদের বর্ধিত মাত্রাকে শ্রমবাজারে অন্তর্ভুক্তি করার জন্য অর্থনীতিতে আরও উৎপাদনশীল চাকুরীর সুযোগ তৈরি করতে হবে। শ্রমশক্তির বড় অংশই অনানুষ্ঠানিক খাতে নিযুক্ত। তরুণদের মধ্যে বেকারত্বের হার উদ্বেগের কারণ হিসাবে অব্যাহত রয়েছে। দক্ষতার চাহিদা এবং যোগানের ক্ষেত্রে এখনও অসামঞ্জস্যতা রয়ে গেছে। বিদেশ গমনের অত্যধিক ব্যয়, প্রতারণা, চুক্তি অনুযায়ী কাজ না দেওয়া এবং কাজের জন্য অগ্রহণযোগ্য বিভিন্ন শর্ত ও বসবাসের জটিলতা বৈদেশিক কর্মসংস্থানের অন্তরায়।

উচ্চ মাধ্যমিক বা তার ওপরের স্তরে নারীদের শিক্ষা ব্যাপক হলেও আন্তর্জাতিক মানে শ্রমশক্তিতে নারীর অংশগ্রহণ (এফএলএফপি) বিশ্ব গড় (৪৯ শতাংশ) এর চেয়ে কম (৩৬.৩ শতাংশ)। উচ্চ শিক্ষিত পুরুষদের তুলনায় উচ্চশিক্ষিত মহিলাদের বেকারত্বের হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি। ব্যবসায়িক পরিবেশের উন্নতির জন্য এই বছর এফডিআই ৩.৬১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যদিও নেট বার্ষিক এফডিআই প্রবাহ কম এবং তা মাত্র কয়েকটি খাত যেমন বস্ত্র ও পোশাক, টেলিযোগাযোগ, জ্বালানী ও বিদ্যুতের মতো কয়েকটি খাতে সংকুচিত হয়ে আছে। ব্যবসা সহজীকরণ এবং ওয়ান স্টপ সার্ভিস (ওএসএস) প্রবর্তন, বিশেষত বন্দরগুলিতে পরিষেবার মান উন্নতি প্রভৃতি চ্যালেঞ্জগুলি বিদ্যমান রয়েছে।

৮.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

শ্রমশক্তির বর্ধিত চাহিদা পূরণে প্রতি বছর অন্তত ৮ শতাংশ হারে প্রবৃদ্ধি অর্জন করা প্রয়োজন। যেহেতু প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি হলো ম্যানুফ্যাকচারিং খাত, তাই আগামী ১৫ বছরে বার্ষিক ১২-১৫ শতাংশ হারে এই খাতের প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে (এডিবি ও আইএলও, ২০১৬)। একই সাথে অর্থনীতির উৎপাদন কাঠামোকে বহুমুখী করে তুলতে হবে। বাংলাদেশ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থান বিশেষ করে, শ্রমনিবিড় বস্ত্র ও পোশাক সম্প্রসারণের মাধ্যমে নারী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিতে সফল হয়েছে। এই ধরনের আরো বিভিন্ন শিল্প সম্প্রসারণের মাধ্যমে বহুমুখীতা অর্জন করা জরুরী।

প্রকারভেদ ও গুনগত মান বিচারে শ্রম বাজারের চাহিদা পূরণের জন্য শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। দ্বিতীয়ত, শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং নিয়োগকারীদের মধ্যে কার্যকর যোগাযোগ থাকতে হবে। শিক্ষার্থীদের জন্য চাকুরীর ব্যবস্থা করতে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রয়োজনীয় দক্ষতা উন্নয়নে নিয়মতান্ত্রিক সহায়তা প্রদান করতে হবে। নিয়োগকর্তাগণ তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখবে।

শ্রম শক্তিতে নারীদের সংশ্লিষ্টতার হার বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ বিভিন্ন রকম বাধার সম্মুখীন হয়েছে। বাল্য বিবাহ ও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সরকার আইনী কাঠামো গড়ে তুলেছে।

দেশে বৈদেশিক বিনিয়োগের পরিমাণ ধীর গতিতে বাড়লেও এই খাত থেকে মোট বিনিয়োগের পরিমান এখনও কম। যাও বা বিনিয়োগ হচ্ছে, তা অল্প কিছু খাতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। এফডিআই এর মাধ্যমে শুধু যে সরাসরি আর্থিক বিনিয়োগ আসছে, তা নয়। এর মাধ্যমে প্রযুক্তি এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনাও আসছে। সামগ্রিক অর্থনীতিতে যার একটি স্পিল ওভার ইফেক্ট রয়েছে। বাংলাদেশকে প্রবৃদ্ধি অর্জন, দারিদ্র্য বিমোচন এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে আরো বেশি পরিমাণে সরাসরি বৈদেশিক বিনিয়োগ আকর্ষণ করতে হবে।

এসডিজি ৯: অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও টেকসই শিল্পায়নের প্রবর্ধন এবং উদ্ভাবনার প্রসারণ

জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের শেয়ার উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বেড়েছে। মোট কর্মসংস্থানে ম্যানুফ্যাকচারিং কর্মসংস্থানের অংশ ২০১৩ অবধি বেড়েছে এবং তারপরে গত দুই বছরে একই অবস্থানে রয়েছে।

কিছু ওঠা নামা সত্ত্বেও অবকাঠামো খাতে আন্তর্জাতিক সহায়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২জি মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার ১০০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে, ৩জি মোবাইল নেটওয়ার্ক প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জুন ২০১৯ এর মধ্যেই ২০২০ সালের মাইলফলক অর্জিত হয়েছে। ৪জি এর কভারেজ জুন ২০১৯ সালে ৭৯ শতাংশে পৌঁছেছে।

৯.১ এসডিজি-৯ এ বাংলাদেশের অগ্রগতির মূল্যায়ন

৯.২.১ জিডিপি ও মাথাপিছু আয়ের অনুপাতে উৎপাদনের মূল্য সংযোজন

তুলনামূলকভাবে উচ্চতর প্রবৃদ্ধির হার অর্জনের ক্ষেত্রে খাত হিসাবে ম্যানুফ্যাকচারিং আরও গতিশীল হয়েছে। ২০০০-২০০১ সাল থেকে জিডিপির অনুপাত ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের সংযোজন ধারাবাহিকভাবে বেড়েছে এবং ২০১৪-২০১৬ সালের মধ্যে ১৯.৪৭ শতাংশে পৌঁছে গেছে। এসডিজি সময়কালের মধ্যও এই ধারা অব্যাহত আছে। এটি লক্ষণীয় বিষয় যে, জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের সংযোজন মূল্য ২০২০ সালে ২১.৫ শতাংশ অর্জন করার লক্ষ্যমাত্রা ২০১৭ অর্থবছরের মধ্যেই অর্জিত হয়েছে। ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের ক্রমাগত বৃদ্ধি বাংলাদেশের জিডিপিতে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। শিল্প খাতের আশি শতাংশ নিয়ে গঠিত ম্যানুফ্যাকচারিং এই উপখাত। ম্যানুফ্যাকচারিং এ প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে শিল্পায়নের গতি বাড়ছে।

সারণী ৯.১ ২০০১-২০০২ থেকে ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত জিডিপিতে ম্যানুফ্যাকচারিং মূল্য সংযোজনের পরিমাণ (শতাংশ)

২০০১-০২	২০০৫-০৬	২০১০-১১	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
১৫.৭৬	১৬.১৩	১৭.৭৫	২০.১৬	২১.০১	২১.৭৪

উৎস: বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস)

৯.২.২ মোট কর্মসংস্থানের অনুপাত হিসাবে ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাতে কর্মসংস্থান (শতাংশ)

ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের উচ্চ প্রবৃদ্ধি এই খাতে অধিক কর্মসংস্থান নির্দেশ করে। ২০১৫ -২০১৬ সালে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে কর্মসংস্থান হ্রাস পেয়েছে। গত দুই বছরের এ খাতে কর্মসংস্থান স্থির রয়েছে, এ ধারা অব্যাহত থাকলে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতে ২০২০ এর মাইলফলক অর্জন করা কঠিন হয়ে পড়বে ।

সারণী ৯.২: মোট কর্মসংস্থানের অনুপাতে ম্যানুফ্যাকচারিং উপখাতে কর্মসংস্থানের পরিমাণ (শতাংশ)

১৯৯৯-২০০০	২০০২-০৩	২০০৫-০৬	২০০৯	২০১০	২০১৩	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭
৭.৩	৯.৭১	১১.০৩	১৩.৫৩	১২.৪৬	১৬.৪	১৪.৪	১৪.৪

উৎস্য : লেবার কোর্স সার্ভে, বিবিএস

৯.গ.১ মোবাইল নেটওয়ার্ক ও প্রযুক্তি ব্যবহারকারী জনসংখ্যার অনুপাত (শতাংশ)

১৯৯০ সালের অক্টোবরে বাংলাদেশে প্রথম মোবাইল ফোন চালু হয় এবং ১৯৯৯ সালে ২জি চালু হয়। পরবর্তীতে ২জি এর স্থলে ৩জি নেটওয়ার্কের সম্প্রসারণ ঘটে। এর মাধ্যমে আগের চেয়ে দ্রুত গতিতে তথ্য আদান-প্রদান করা এবং প্রথম ভিডিও কলিং সেবার সুবিধা চালু হয়। ৪জি চালু হয় ফেব্রুয়ারী, ২০১৮ সালে। ২জি মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারী জনসংখ্যার হার ১০০ শতাংশের কাছাকাছি পৌঁছেছে, ৩জি মোবাইল নেটওয়ার্ক ব্যবহারকারীর জনসংখ্যার ক্ষেত্রে জুন ২০১৯ এর মধ্যেই ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হয়েছে। ৪জি এর কভারেজ জুন ২০১৯ সালের মধ্যে ২০২০ সালের লক্ষ্যমাত্রা ৭৯ শতাংশে পৌঁছেছে।

সারণী ৯.৩: মোবাইল নেটওয়ার্কের আওতায় জনসংখ্যার অনুপাত (শতাংশ)

প্রযুক্তি	২০১২	২০১৩	২০১৪	২০১৫	২০১৬	২০১৭	২০১৮	২০১৯ (জুন পর্যন্ত)
২জি	৯৯	৯৯	৯৯	৯৯.৪	৯৯.৪৬	৯৯.৪৯	৯৯.৫৪	৯৯.৬
৩জি	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	প্রযোজ্য নয়	৭১	৯০.২	৯২.৫৫	৯৫.২৩	৯৫.২৩
৪জি							চালু হয়	৭৯

উৎস: বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন ২০১৯

৯.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

পুনর্বাসন ও ক্ষতিপূরণ জটিলতার পাশাপাশি জমি অধিগ্রহণের জটিলতার জন্য পরিবহন ও যোগাযোগ সেক্টরের উন্নতি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। এর পাশাপাশি রয়েছে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলি তার মধ্যে রাস্তা নির্মাণ, প্রযুক্তি, পর্যাপ্ত অর্থ, সঠিক ডেটা এবং অ্যাক্সেল লোড প্রভৃতির ব্যবস্থাপনা চ্যালেঞ্জ। নিরাপদ সড়কের জন্য রাস্তার সুরক্ষা, রক্ষণাবেক্ষণ, যথাযথ এবং পর্যাপ্ত রাস্তা নির্মাণ, সড়ক দূর্ঘটনার তথ্য এবং ব্যবহারকারীদের সচেতনতার পাশাপাশি ট্র্যাফিক পুলিশের বিশেষ মনোযোগ প্রয়োজন।

পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে প্রকল্প বাস্তবায়নে একটি বড় চ্যালেঞ্জ হলো সক্ষমতা সীমাবদ্ধতা যার কারণে প্রায়ই প্রকল্প সমাপ্তি বিলম্বিত হয়। বিলম্ব এবং সময়মতো অর্থ ছাড় না হওয়ার ফলে ব্যয় বৃদ্ধি এবং বিনিয়োগের সুফল প্রাপ্তির হার কম হয়। অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ, নিম্নমানের উপকরণে অবকাঠামো ইত্যাদি প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে।

৯.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

এসডিজি ৯ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারি নানা প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। একদিকে অবকাঠামো, সবধরনের যোগাযোগ মাধ্যম এবং আইসিটি অবকাঠামো নিশ্চিত করেছে এবং অন্যদিকে বেসরকারী খাতের বিনিয়োগকে নীতি সহায়তা প্রদানের পাশাপাশি সরকারী-বেসরকারী অংশীদারিত্ব বৃদ্ধি করেছে। অর্থায়ন, বাস্তবায়ন সংস্থাগুলির সীমাবদ্ধতা, জমি অধিগ্রহণের জটিলতা এই খাতের অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ। জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্ধিত প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি মোকাবেলায় বাংলাদেশ অভিঘাতসহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ করছে। এর পাশাপাশি টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে ম্যানুফ্যাকচারিং খাতের প্রবৃদ্ধিকেও অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং টেকসই হতে হবে।

এসডিজি- ১০: অন্তঃ ও আন্তদেশীয় অসমতা কমিয়ে আনা

প্রবৃদ্ধি প্রসারণ এবং দারিদ্র্য হ্রাসে সরকারি নীতিসমূহ অনেকখানি কার্যকর হলেও ক্রমবর্ধমান আয় বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে খুব একটা সফল হতে পারেনি। সাম্প্রতিক তথ্য অনুসারে (এইচআইইএস ২০১৬ বিবিএস), আয় বৈষম্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

আন্তঃদেশীয় আয়ের বৈষম্য হ্রাস করার ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নয়ন ঘটেছে। নিরাপদ অভিবাসন উৎসাহিত করার লক্ষ্যে অভিবাসী ও তাদের পরিবারের সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার ২০১৬ সালের জানুয়ারিতে "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬" গ্রহণ করেছে।

বৈদেশিক সহায়তা ক্রমশঃ বাড়ছে যা এসডিজির সময়কালে অব্যাহত রয়েছে। বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৮ সালে ৩৬১৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা ২০১৭ সালের তুলনায় ৬৮ শতাংশ বেড়েছে।

১০.১ এসডিজি-১০ এ বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন

১০.৭.১ গন্তব্য দেশে অর্জিত বার্ষিক আয়ের অংশ হিসেবে নিয়োজিত ব্যক্তির ব্যয়কৃত নিয়োগ খরচ

বর্তমানে প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশী বিশ্বের ১৬১টি দেশে কাজ করে দেশে রেমিট্যান্স প্রেরণ করছে যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দারিদ্র্য নিরসনে অবদান রাখছে। অভিযোগ রয়েছে বিদেশ গমনে অতিরিক্ত খরচ হয়, এই অভিযোগ না থাকলে অস্থায়ী কর্মীদের একটি বৃহৎ অংশ বিদেশে কাজ করতে যেতে পারত এবং রেমিট্যান্স পাঠাতে পারত। এই প্রেক্ষিতে, সরকার অভিবাসী শ্রমিকদের বার্ষিক আয়ের অনুপাত হিসাব করে অভিবাসন খরচ এবং নিয়োগের ব্যয় হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যা বেসলাইন হিসাবে ২০১৬ সালে ১৭টি দেশের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বেসলাইন বছরে নিয়োগ ব্যয় / বার্ষিক আয়ের অনুপাত দেশ ভিত্তিক ভিন্ন হতে পারে। যেমন কাতারের ক্ষেত্রে ১০ শতাংশ এবং মিশরের ক্ষেত্রে ৬৭ শতাংশ নিয়োগ ব্যয় প্রাপ্ত বার্ষিক আয়ের।

১০.৭.২: অভিবাসন নীতিমালা গ্রহণ করেছে এমন দেশের সংখ্যা।

বাংলাদেশে ২০১৬ সালের জানুয়ারি মাসে "প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতিমালা-২০১৬" অনুমোদিত হয়।

১০.ক.১ বিনা শুল্কে স্বল্পোন্নত দেশ হতে আমদানি

ডব্লিউটিও (WTO) এর দোহা রাউন্ড অনুযায়ী এখনও স্বল্পোন্নত দেশসমূহ থেকে বিনা শুল্কে আমদানির বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে।

১০.খ.১ উন্নয়ন কাজের জন্য অর্থ প্রাপ্তির (উদাহরণ সরকারি উন্নয়ন সহায়তা, বিদেশী প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ এবং অন্যান্য উৎস)

বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে যা এসডিজির সময়কালে অব্যাহত রয়েছে। বার্ষিক হ্রাস-বৃদ্ধিসহ বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ বৃদ্ধির প্রবণতা দেখা যায়, যা ২০১৮ সালে ৩৬১৩.৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। অন্যদিকে, ২০১৭-২০১৮ সালে অব্যাহত সরকারি উন্নয়ন সহায়তা বৃদ্ধি পেয়ে ৪৬৬২.৫২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।

সারণী ১০.১: অর্থের যোগান অনুসারে উন্নয়নের জন্য সম্পদ প্রবাহ (মার্কিন ডলার)

	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
ওডিএ	৩১০৪.৫০	৩৩৪৯.৪০	৩৯৬৬.২৮	৪৬৬২.৫২
এফডিআই*	২২৩৫.৩৯	২৩৩২.৭২	২১৫১.৫৬	৩৬১৩.৩০

উৎস : অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ

১০.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

ক্রমবর্ধমান বৈষম্য অথবা সম্পদের কেন্দ্রীকরণ বাংলাদেশে দারিদ্র্য হ্রাস এবং আপেক্ষিক বঞ্চনার বিরুদ্ধে একটি চ্যালেঞ্জ। সকল প্রকার আয়কে এখনও প্রগতিশীল করের আওতায় আনার বিষয়টি পুরোপুরি কার্যকর করা যায়নি।

রেমিট্যান্স নির্ভর ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগ গ্রামীণ জনপদে মহিলাদের ক্ষমতায়ন ও দারিদ্র্য বিমোচনে ভূমিকা রাখবে। তাই এগুলোর বিনিয়োগে উৎসাহিত করা উচিত। এসএমইগুলির উন্নয়নে আর্থিক সহায়তা এবং প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে। ঋণ ও ক্ষুদ্র-ঋণ সরবরাহকারী আর্থিক সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধিতে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া উচিত। উদ্যোক্তাদের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও প্রশিক্ষণ সুবিধা, ঝুঁকির ক্ষেত্রে নিরাপত্তা বিধান (যেমন-বীমা) এবং অস্থিতিশীল ঋণের বোঝা পরিশোধে সহায়তা প্রদান করা উচিত। সরকার দেশের মূলধারার আর্থ-সামাজিক কর্মকাণ্ডে প্রত্যাবাসীদের সম্পৃক্ত করতে কাজ করে যাচ্ছে।

১০.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

দেশে দারিদ্র্য নিরসন এবং প্রবৃদ্ধির ক্ষেত্রে বৈষম্য বৃদ্ধির উর্ধ্বমুখী প্রবণতার প্রভাব সম্পর্কে সরকার সচেতন আছে। বৈষম্য হ্রাস করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হল শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যসেবায় দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিতদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

ক্ষুদ্র ঋণ দরিদ্রদের সম্পদ জমা করতে এবং দারিদ্র্য থেকে বেরিয়ে আসতে সহায়তা করছে। একইভাবে, এসএমই ঋণ ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের সম্পদ সংগ্রহ করতে এবং কম দক্ষ বা আধা দক্ষ কর্মীদের জন্য কর্মসংস্থান তৈরি করতে সহায়তা করছে।

সরকার প্রবৃদ্ধি অর্জন ধরে রাখার জন্য সামাজিক সুরক্ষার আওতায় সকল দরিদ্র জনগণকে নিয়ে আসার উদ্যোগ নিয়েছে এবং সামাজিক সুরক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বৈশ্বিক ধাক্কার প্রভাব থেকে এদেরকে রক্ষা করছে এবং এগুলো প্রশমনের চেষ্টা করছে।

দরিদ্রের উন্নয়নে শ্রমিকদের অভিবাসন এবং এর যথাযথ ভূমিকার উপর জোর দেয়া দরকার। এই পরিপ্রেক্ষিতে অভিবাসন কার্যক্রম জাতীয় উন্নয়ন প্রক্রিয়ার মূলধারায় নিয়ে আসতে হবে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ কার্যকরভাবে প্রয়োগ করা দরকার।

এসডিজি ১১: অন্তর্ভুক্তিমূলক, নিরাপদ, অভিঘাতসহনশীল এবং টেকসই নগর ও জনবসতি গড়ে তোলা

২০১৬ সালের হিসাব অনুসারে, তুলনামূলকভাবে বাংলাদেশে নগরায়ণের মাত্রা ধীর গতির এবং বাংলাদেশের জনসংখ্যার ৩৫ শতাংশ মাত্র শহরাঞ্চলে বসবাসরত। মাথাগুণতিতে শহরে বাস করা মানুষের সংখ্যা ৫৬.২৮ মিলিয়ন, যা জনসংখ্যার হিসেবে কম নয়। শহুরে জনসংখ্যার প্রায় ৪৪ শতাংশ অস্থায়ী কাঠামোতে বাস করে এবং ২৯ শতাংশ আধা-স্থায়ী কাঠামোতে বাস করে। সুতরাং, শহুরে পরিবারের একটি বড় অংশ নিম্নমানের বাসস্থানে বাস করে। এইচআইইএস (HIES) ২০১৬ হতে দেখা যায়, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলিতে আবাসনের মানের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে তথাপি প্রায় ৯৬ শতাংশ বস্তি পরিবার নিম্নমানের (পাকা নয়) ঘরে বাস করে।

১১.১ এসডিজি-১১ তে বাংলাদেশের অগ্রগতির মূল্যায়ন

জনগণের আবাসন নিশ্চিত করতে সরকার বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এটি সরকারি চাকুরীজীবীদের আবাসন সুবিধার জন্য বাড়ী এবং ফ্ল্যাট নির্মাণ করেছে। নিম্ন ও মধ্য আয়ের জনগণের জন্য আবাসিক প্লট উন্নয়ন করেছে। জমির তীব্র ঘাটতির পরিপ্রেক্ষিতে বহুতলবিশিষ্ট ভবন তৈরি করে ফ্ল্যাটগুলি সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রয় করছে। সরকার ঢাকার বস্তিবাসীদের পুনর্বাসনের জন্য ১০,০০০ আবাসিক ফ্ল্যাট নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে।

চলমান নগর উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ সমাপ্ত হলে ৭৩৬০ কিলোমিটার রাস্তা, ১৫০২ কিমি ড্রেন, ৩৩২৯ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট, ৩৬টি বাস/ট্রাক টার্মিনাল, ২২ টি ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র, ১৫২ কিলোমিটার ফুটপথ, ৪০টি বর্জ্য নিষ্কাশন কেন্দ্র এবং ৩৫ টি বর্জ্য পরিশোধন প্ল্যান্ট নির্মিত হবে।

২০৩৫ সালের মধ্যে ঢাকার পাঁচটি মেট্রোরেল লাইন, দুটি দ্রুত ট্রানজিট বাস রুট, ১,২০০ কিলোমিটার নতুন রোডওয়ে, ছয়টি ফ্লাইওভার এবং তিনটি রিং রোড নির্মাণ শেষ হলে ঢাকায় নগর পরিবহণ ব্যবস্থার যথেষ্ট উন্নতি হবে। উত্তরা ও মতিঝিলের মধ্যে একটি মেট্রোরেল লাইন এবং গাজীপুর থেকে মহাখালী পর্যন্ত একটি দ্রুত বাস লাইন ২০১৯ সালের মধ্যে নির্মিত হবে যা কিছুটা হলেও পরিবহন সমস্যার সমাধান করবে।

বাংলাদেশ স্বাভাবিক আবহাওয়া পরিস্থিতির জন্য নির্দিষ্ট বায়ুমান (AQ) নির্ধারণ করেছে এবং অতীতের বায়ু দুষণকারী নির্গমন উৎসগুলিকে চিহ্নিত করে বায়ু দুষণের ঘনত্বকে হ্রাস করার লক্ষ্যে একাধিক সুনির্দিষ্ট কৌশল গ্রহণ করেছে।

১১.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

দ্রুত নগরায়নের ফলে আবাসন ঘাটতির কারণে তৈরি আবাসনগুলির চাহিদা বাড়ছে। বর্তমানে শহর এলাকায় জমি এবং আবাসনের অপ্রতুলতা রয়েছে এবং ভবিষ্যতে এই ঘাটতি অব্যাহত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে ফলে স্বল্প ও মধ্য আয়ের পরিবারের জন্য আবাসন ক্রয় করা কঠিন হয়ে পড়ছে।

জ্বালানী চালিত নির্মাণ সামগ্রীর চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এগুলো প্রস্তুতে বাংলাদেশে বিশেষ করে শহরগুলিতে বায়ু দূষণের প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সাম্প্রতিক বছরগুলিতে দেশে দ্রুত নগরায়ণ এবং সামগ্রিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ফলে উন্নত নগর সেবার চাহিদা যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে।

উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো বাস্তবায়নের সময় মানুষকে নানারকম দুর্ভোগ পোহাতে হয় যা এজেন্সিগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন ও পর্যায়ক্রমিকভাবে পরিপূরক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে এই সমস্যা এড়ানো যায়।

১১.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

ঢাকা উত্তর, ঢাকা দক্ষিণ এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আরবান রিসিলিয়েন্স প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এটি কেন্দ্রীয়ভাবে সমন্বিত এবং স্থানীয়ভাবে পরিচালিত দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার (ডিআরএম) জন্য একটি সক্ষম পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করছে। এই প্রকল্প প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি, জরুরী অপারেশন কেন্দ্র, জরুরী গুদাম, উপগ্রহ নিয়ন্ত্রণ কক্ষ, জরুরি ব্যবস্থাপনার ভারী সরঞ্জাম, উদ্ধার ও জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম সংগ্রহ করবে।

এসডিজি ১২: পরিমিত ভোগ ও টেকসই উৎপাদনধরন নিশ্চিত করা

মোট উৎপাদিত খাদ্যের প্রায় ৫.৫ শতাংশ অপচয় হয়ে যায়, যার মধ্যে ৩ শতাংশ অপচয় হয় প্রক্রিয়াজাতকরণকালীন সময়ে, ১.৪ শতাংশ নষ্ট হয় বিতরণের সময় এবং অবশিষ্ট ১.১ শতাংশ অপচয় হয় খাবারের পাত্র থেকে।

২০০৫ সালের হিসেব মতে, বাংলাদেশের নগর কেন্দ্রিক উৎপাদিত অপচনশীল মোট বর্জ্যের পরিমাণ দিনে ১৩,৩৩২.৯ টন, যার মধ্যে কেবল ঢাকা ও চট্টগ্রামেই উৎপাদিত হয় মোট বর্জ্যের যথাক্রমে ৩৪.৮ শতাংশ এবং ১১.৬ শতাংশ, যা অবশ্যই এখন অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

১২.১ এসডিজি-১২ তে বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন

২০১২ সালে টেকসই উন্নয়নের উপর জাতিসংঘ সম্মেলনে (রিও+২০) বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানগণ টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে টেকসই উৎপাদন প্রক্রিয়া ও ভোগের ওপর ১০ বছর মেয়াদি কর্মব্যবস্থা গ্রহণ করে (১০ওয়াইএফপি)। এটি একটি বৈশ্বিক কর্মকাঠামো যার মাধ্যমে দেশসমূহ টেকসই ভোগ ও উৎপাদনের দিকে ধাবিত হবে এবং টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট-১২ এর সূচক ১২.১.১ অর্জনে এগিয়ে যাবে।

সরকার অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক অন্তর্ভুক্তি ও টেকসই পরিবেশ নিশ্চিতকরণের ক্ষেত্রে প্রাকৃতিক, অবকাঠামোগত এবং সামাজিক মূলধনের সীমাবদ্ধতার বিষয়ে সচেতন রয়েছে। বাংলাদেশ এসসিপি'র ওপরে ১০ বছর মেয়াদী কর্মকাঠামো প্রস্তুত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১২.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

বিশ্বব্যাপী খাদ্যহানি ও খাদ্য অপচয় একটি বড় সংকট, বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে যেখানে এখনো অনেক অনেক মানুষ ক্ষুধার্থ। জলবায়ুর পরিবর্তন, বাজার কাঠামো ও মূল্য গঠন পদ্ধতি, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, সংরক্ষণ, এবং চাষাবাদকালীন নানা সমস্যার কারণে খাদ্যহানী ঘটে। ফসল উত্তোলনকালীন সময়ে এ ধরনের নানা সমস্যার কারণে বাংলাদেশের মোট উৎপাদনের ১০ শতাংশই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

খাদ্য অপচয় হলো, মানুষের ভোগ উপযোগী সেই পরিমাণ খাবার যা খুচরা বিক্রেতা ও ভোক্তার বিভিন্ন আচরণের কারণে নষ্ট হয়ে যায় এবং আর ভক্ষণযোগ্য থাকে না। খাদ্য অপচয় কমানো এবং টেকসই ভোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড চ্যালেঞ্জ হলো মানুষের অভ্যাসের পরিবর্তন ঘটানো।

১২.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

ভূ উপরিস্থ পানি ব্যবহার করে সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, ভারসাম্যপূর্ণ সার ব্যবহার, জৈব সারের ব্যবহার বৃদ্ধি এবং ফসল উত্তোলনকালীন ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতা বৃদ্ধি, সমন্বিত পোকামাকড় ও রোগবালাই দমন করার মাধ্যমে টেকসই ফসল উৎপাদন নিশ্চিত করা হবে।

মোট বিদ্যুৎ উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে নবায়নযোগ্য সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির ব্যবহার এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা বিধানের সাথে সাথে কয়লাভিত্তিক ও পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।

ভূ উপরিস্থ পানি ও বৃষ্টির পানি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে পর্যাপ্ত পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা হবে। পানির গুণগত মান রক্ষার্থে শিল্পদূষণ কমানোর জন্য আর্থিক এবং অন্যান্য সহায়তা প্রদান এবং পরিবেশ সংরক্ষণ আইন বাস্তবায়ন করতে হবে।

ক্ষতিকর কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ রোধ করতে পুরনো মেয়াদোত্তীর্ণ যানবাহন চলাচল বাতিল, উন্নত গণপরিবহন চালু এবং খানা কেন্দ্রিক রান্না বান্না ও ইটভাটার চুল্লীগুলোতে প্রযুক্তি-নির্ভর দক্ষ জ্বালানীর ব্যবস্থা করা হবে।

সূচক ১৩.১.১ অনুযায়ী যদি দেখা হয়, তবে প্রতি ১০০,০০০ জনে মৃত, নিখোঁজ মানুষসহ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা এখন ১২,৮৮১। এই সংখ্যা ২০২০ সালের মধ্যে ৬,৫০০ ও ২০৩০ সালের মধ্যে ১৫০০ তে নামিয়ে আনার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার এযাবৎকালের ধারা বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন তেমন কঠিন কিছু নয়। সরকার Sendai ফ্রেমওয়ার্ক ধরে প্রস্তুতকৃত 'বাংলাদেশের দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস কৌশল (২০১৬-২০২০)' ইতোমধ্যে অনুমোদন করেছে যা এ লক্ষ্য অর্জনে সহায়ক হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জের মুখে এ সংকট মোকাবিলায় জলবায়ুজনিত বেশ কিছু কৌশল, পরিকল্পনা ও কর্মকাণ্ড নিয়ে বাংলাদেশ এখন বেশ ভালভাবে প্রস্তুত হচ্ছে। বিগত ৮ বছরে বিসিসিটিএফ-এর মাধ্যমে বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজনে প্রায় ২৭০০ কোটি টাকা খরচ করেছে। ইতোমধ্যে বিসিসিএসএপি সংশোধন ও এনএপি প্রণয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

১৩.১ এসডিজি-১৩ তে বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন

১৩.১.১ প্রতি ১০০,০০০ জনে মৃত ও নিখোঁজসহ দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বিভিন্নভাবে দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে, যেমন, চরম তাপমাত্রা, অনিয়মিত বৃষ্টিপাত এবং তীব্রতর বন্যা, খরা এবং বঙ্গোপসাগরে বিরাজমান উত্তাল আবহাওয়া। বাংলাদেশের দূর্যোগ সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ২০১৫ অনুযায়ী, দেশের প্রায় ১৩ শতাংশ খানা এবং ১২.৬৫ শতাংশ জনগণ দূর্যোগপ্রবণ এলাকায় বসবাস করে। ২০১৪ সালে প্রতি ১০০,০০০ জনের মধ্যে ১২,৮৮১ জন দূর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

সূচক ১৩.১.২ সেন্ডেই দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কাঠামো ২০১৫-২০৩০ অনুসরণ করে জাতীয় দুর্যোগ প্রশমন কৌশল অবলম্বন ও বাস্তবায়ন করেছে এমন দেশের সংখ্যা।

সরকার ইতোমধ্যে সেন্ডেই দুর্যোগ ঝুঁকিপ্রশমন কৌশল (২০১৫-২০৩০) ও সরকার অনুমোদিত অন্যান্য আন্তর্জাতিক প্রোটকল মেনে বাংলাদেশে দুর্যোগ ঝুঁকি উপশমন কৌশলপত্র (২০১৬-২০২০) অনুমদেন করেছে।

১৩.২.১ একটি সমন্বিত নীতি/কৌশল/পরিকল্পনা প্রণীত বা প্রযুক্ত রয়েছে এমন দেশের সংখ্যা, যা ঐ সকল দেশের জলবায়ু পরিবর্তনের ক্ষতিকর প্রভাবের সাথে অভিযোজনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং ক্ষতিকর প্রভাবের সাথে অভিযোজনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করে এবং জলবায়ু সহিষ্ণুতা বৃদ্ধি সহ গ্রিনগ্যাস নির্গমন এমনভাবে কমিয়ে আনে যাতে খাদ্য উৎপাদন কোনোপ্রকার হুমকির সম্মুখীন না হয় (যেমন, জাতীয় অভিযোজন, পরিকল্পনা, জাতীয়ভাবে স্থিরীকৃত অবদান, জাতীয় যোগাযোগ, দ্বিবার্ষিক অগ্রগতি প্রতিবেদন বা অন্যান্য)।

Bangladesh Climate Change Strategy and Action Plan (বিসিসিএসপি) হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রধান জাতীয় পরিকল্পনা এবং বাংলাদেশে জলবায়ুজনিত বিনিয়োগের ভিত্তি। অভিযোজনের প্রয়োজনীয়তা এবং উন্নয়নের লক্ষ্যে সরকারের নিম্ন কার্বন-পথ অনুসরণ করার আকাঙ্খা বিবেচনায় রেখে বিসিসিএসপি কর্ম-পদক্ষেপ নেবার জন্য একটা সার্বিক নির্মাণ কাঠামো প্রদান করবে। ২০১৫ সালে জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনার (এনএপি) একটা রোডম্যাপ প্রস্তুত করা হয়। বাংলাদেশ সরকার Climate Change Trust Act 2010 প্রণয়ন ও আইনে পরিণত করে। এর প্রধান উদ্দেশ্য জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিরূপ প্রভাব হ্রাস করা। বাংলাদেশেই একমাত্র প্রথম দেশ যে Bangladesh Climate Change Trust Fund নামে একটা ট্রাস্ট ফান্ড সৃষ্টি করে যার লক্ষ্য বিসিসিএসএপি বাস্তবায়নে সহায়তা দিতে গিয়ে জলবায়ু পরিবর্তনে বিনিয়োগগুলোর জন্য জাতীয় পর্যায়ে সম্পদের সংস্থান করা। Intended Nationally Determined Contributions (আইএনডিসি): আইএনডিসি'র (বর্তমানে এনডিসি) মূল কাজ অভিযোজন ও উপশমন কৌশল সাজিয়ে জলবায়ু অভিঘাতসহনীয় করে তোলা।

১৩.খ.১ নারী, যুবসমাজ, স্থানীয় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ওপর অগ্রাধিকারসমূহ জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কিত কার্যকর পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য স্বক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে গৃহীত কর্মপদ্ধতি এবং অর্থায়ন, প্রযুক্তি ও সক্ষমতা বিনির্মাণসহ সহায়তার পরিমাণ ও বিশেষ সহায়তাপ্রাপ্ত স্বল্পোন্নত দেশ এবং উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপ বা রাষ্ট্রের সংখ্যা ।

২০১৮ সালে বাংলাদেশ তিনটি প্রকল্পের জন্য Green Climate Fund (জিসিএফ) থেকে অর্থায়ন পেয়েছে, যথা: বাংলাদেশে বৈশ্বিক পরিচ্ছন্ন রান্না কর্মসূচি, জলবায়ু-প্রসূত লবণাক্ততার প্রভাব মোকাবিলায় উপকূলীয় অঞ্চলের জনগণের অভিযোজন ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ।

১৩.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

বিগত বছরগুলোতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অবকাঠামোতে বাংলাদেশ বিপুল পরিমাণে বিনিয়োগ করেছে যেমন, বন্যানিয়ন্ত্রণ বাঁধ-নির্মাণ, বন্যা আশ্রয়স্থল স্থাপন, সাইক্লোন আশ্রয় গড়ে তোলা ইত্যাদি। এর ফলে ইদানিং মৃত্যুর হার তাৎপর্যপূর্ণভাবে হ্রাস পেয়েছে। যাই হোক, এই সমস্ত অবকাঠামোর অনেকগুলো সঠিকভাবে পরিচালন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হয় না বিধায় দুর্যোগ আঘাত হানার সময় পর্যাপ্ত সুরক্ষা দিতে ব্যর্থ হয়। অন্যদিকে, বড় অংকের অর্থের অভাবে দুর্যোগের পরপর এসমস্ত অবকাঠামোর পুর্নবাসন করা কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রে বিশেষ উদাহরণ হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে ২০০৭ ও ২০০৯ সালে সংঘটিত যথাক্রমে সিডর

ও আইলার পর উপকূলীয় পোল্ডার পুর্নবাসনে দীর্ঘসূত্রিতার ব্যাপরটি যখন পোল্ডারের ভেতর দীর্ঘদিন জলাবদ্ধতার কারণে জনগণের দুর্ভোগ চরমে উঠেছিল। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এ ধরনের সংকট আরও প্রকট ও তীব্রতর হবে যখন জলবায়ুজনিত পরিবর্তনের কারণে ঘন ঘন প্রাকৃতিক দূর্যোগ আঘাত হানতে থাকবে।

১৩.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

প্যারিস জলবায়ু চুক্তিতে বাংলাদেশ স্বাক্ষরদাতা। এই চুক্তির অধীন বাংলাদেশ শিল্পোন্নত দেশ থেকে অভিযোজন সম্পর্কিত অর্থায়ন প্রত্যাশা করতে পারে। নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, এই দেশে দুর্যোগ অভিঘাত সহনশীল ভবিষ্যত সৃষ্টি করতে হলে ভবিষ্যতে প্রচুর অর্থায়নের প্রয়োজন পড়বে। আর সেক্ষেত্রে ন্যয়সঙ্গতভাবেই প্রত্যাশা করা যায় যে, বাংলাদেশের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ আসবে শিল্পোন্নত দেশ থেকে। অবশ্য কিছু অর্থায়ন এসেছে সম্প্রতি স্থাপিত Green Climate Fund সূত্রে তবে এই ধরনের খুব প্রতিযোগতামূলক অর্থ পেতে হলে বাংলাদেশেকেও তার প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে হবে আর জলবায়ু সংক্রান্ত নীতিগুলোকে উন্নয়নের মূলস্রোতে নিয়ে আসতে হবে। অধিকন্তু জলবায়ুর প্রভাব মোকাবিলায় দীর্ঘ মেয়াদী অভিযোজনমুখী ব-দ্বীপ পরিকল্পনা ২১০০ এর সফল বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোকে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

এসডিজি ১৪: টেকসই উন্নয়নের জন্য সাগর, মহাসাগর ও সামুদ্রিক সম্পদের সংরক্ষণ এবং টেকসই ব্যবহার

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ একটি বিরাট সমুদ্র এলাকা অর্জন করেছে (মোট ১১৮,৮১৩ কি:মি:)। এই বিশাল সামুদ্রিক অঞ্চল প্রাকৃতিক গ্যাস এবং জীববৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। সাম্প্রতিক সময়ে দু'টি সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা ঘোষণা করা হয়েছে, যার একটি হলো ইলিশের নিরাপদ প্রজনন কেন্দ্র এবং অন্যটি তিমির অভয়ারণ্য। মোট সংরক্ষিত এলাকার পরিমাণ বর্তমানে মোট সামুদ্রিক এলাকার প্রায় ২.০৫ ভাগ। সবচেয়ে বেশি সাফল্য এসেছে ইলিশ সংরক্ষণ ও উৎপাদনে; বিগত ১৫ বছরে যা প্রায় দ্বিগুণ হয়েছে।

১৪.১ এসডিজি-১৪ তে বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন

১৪.৫.১ সামুদ্রিক অঞ্চলের মধ্যে সংরক্ষিত এলাকার বিস্তৃতি

দেশের প্রথম সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা হিসেবে সরকার ২৭ অক্টোবর, ২০১৪ তারিখে "The Swatch of No Ground Marine Protected Area" প্রতিষ্ঠা করে, যা তিমি, ডলফিন, সামুদ্রিক কচ্ছপ, হাঙর এবং অন্যান্য সামুদ্রিক প্রাণীদের সুরক্ষায় ভূমিকা রাখবে। বাংলাদেশ বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ এর আওতায় বঙ্গোপসাগরের সোয়াচ অব নো গ্রাউণ্ড এবং সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ অধ্যাদেশ ১৯৮৩ এর আওতায় বঙ্গোপসাগরের "Middle ground and South Patches" দেশের প্রধান দু'টি সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে, যার বিস্তৃত জলসীমার পরিমাণ ২৪৩,৬০০ হেক্টর (২৪৩৬ বর্গ কি:মি:), এবং সেটা দেশের মোট সামুদ্রিক জলসীমার প্রায় ২.০৫ ভাগ। বাংলাদেশের মোট সামুদ্রিক জলসীমা হলো ১১,৮৮১,৩০০ হেক্টর (১১৮,৮১৩ বর্গ কি:মি:)। ইলিশের ডিম ছাড়ার মৌসুমে সংরক্ষিত এলাকা হিসেবে নিলে মোট সংরক্ষিত এলাকার বিস্তৃতি বেড়ে দাঁড়ায় জলসীমার ৭.৯৪ ভাগ।

১৪.৭.১: উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রসমূহে, স্বল্পোন্নত দেশগুলোতে ও সকল দেশে জিডিপি'র অনুপাত হিসেবে টেকসই মৎস্য আহরণ ও চাষ

জিডিপি'র অনুপাত হিসেবে টেকসই মৎস্য আহরণ ও চাষের পরিমাণ ২০১৫ সালের ৩.২৯ শতাংশ হতে হ্রাস পেয়ে ২০১৮ সালে হয়েছে ৩.১৪ শতাংশ। মৎস্য আহরণ ও চাষের পরিমাণ বৃদ্ধির তুলনায় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার বেশি হওয়াই এর কারণ।

যাই হোক, ইলিশ সংরক্ষণ এবং ইলিশ উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান হার ঠেকাতে সরকার "মৎস্য সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা আইন ১৯৫০" এর আওতায় উপকূলীয় লোনা ও মিঠাপানির এলাকায় ইলিশের জন্য পাঁচটি অভয়ারণ্য এবং চারটি ডিম নিঃসরণ ও প্রজনন ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করেছে। জাটকা নিধন রোধ এবং মা ইলিশ সংরক্ষণ ও পরিচর্যাও এই আইনের আওতাভুক্ত। সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ অধ্যাদেশ-১৯৮৩ এর অধ্যায় ৫৫ (উপ-অধ্যায় ২, ঘ) এর মাধ্যমে সমুদ্র ও সমুদ্র উপকূলীয় এলাকায় ইলিশের প্রজনন ও ডিম ছাড়ার মৌসুমে অবাধ চলাচল ও নিরাপদ প্রজনন নিশ্চিত করতে মোট ২২ দিন (১২ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর, ২০১৬) সব ধরনের মাছ ধরা এবং মাছ ধরার বাণিজ্যিক ট্রলার চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে।

১৪.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

সাধারণত তেল কোম্পানী এবং নিলামকারীরা সহজসাধ্য ও স্বল্প ব্যয়ের কারণে সমুদ্র উপকূলীয় অগভীর অঞ্চলে খনন করতে আগ্রহী হয়, কিন্তু এই সকল এলাকায় খনন কাজের ফলে সামগ্রিক পরিবেশ, আর্থ-সামাজিক অবস্থা এবং মৎস্য সম্পদের ওপর বিরাট বিরূপ প্রভাব পড়ার আশঙ্কা থাকে।

উপকূলীয় এলাকায় অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ, অধিক পরিমাণে পোনা মাছ নিধন, বিভিন্ন বাঁধ নির্মাণ, পলি জমা, কীটনাশকের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার ও দূষণ ইত্যাদির কারণে উপকূলীয় এলাকার জীববৈচিত্র্য দ্রুত কমে আসছে এবং পরিবেশগত বিপর্যয় ডেকে আনছে। মনুষ্য সৃষ্ট দূষণ ও মৎস্য চাহিদা ও আহরণ প্রতিবছরই ক্রমান্বয়ে বেড়ে চলেছে ।

১৪.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

উপকূলীয় অঞ্চল এবং এর পাশ্ববর্তী অঞ্চলের সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং শিল্প কর্মকাণ্ডের মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা প্রয়োজন। টেকসই মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য মৎস্য আহরণও টেকসই পরিমাণে বজায় রাখতে হবে। মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণের নিমিত্ত সরকার ইতোমধ্যে মৎস্য প্রজনন মৌসুমে বঙ্গোপসাগরে ২ মাস মাছ ধরা নিষিদ্ধ করেছে এবং প্রায় তিন দশক পরে উপকূলীয় এলাকায় মাছের প্রাচুর্যতা পর্যবেক্ষণের জন্য এ বছর মৎস্য সংখ্যা পর্যবেক্ষণ শুরু হয়েছে, ২০১৯ সালের মধ্যে যা শেষ হবে বলে আশা করা যায়। একই সাথে সমুদ্র সম্পদের টেকসই ব্যবহারের জন্য একটি কার্যকর ব্যবস্থাপনা বা কৌশলগত পরিকল্পনা তৈরি করা হচ্ছে।

এসডিজি ১৫: স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের পুনরুদ্ধার ও সুরক্ষা প্রদান এবং টেকসই ব্যবহারে পৃষ্ঠপোষণা, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা, মরুকরণ প্রক্রিয়ার মোকাবেলা, ভূমির অবক্ষয় রোধ ও ভূমি সৃষ্টি প্রক্রিয়ার পুনরুজ্জীবন এবং জীববৈচিত্র্য হ্রাস প্রতিরোধ

বর্তমানে দেশে নিবেদিত বনায়নের হার মাত্র ১৪.৪৭ শতাংশ (বিএফডি, ২০১৮)। তবে উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে বনের গুণগতমান, যা পল্লববিতানের বিস্তৃতির ওপর নির্ভর করে। আর তাই গাছ-গাছালির সংখ্যা বৃদ্ধির মাধ্যমে গাছের ঘনত্ব বৃদ্ধি সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম লক্ষ্য। তাছাড়া জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে বাংলাদেশ বেশ কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে, যার মধ্যে আছে গাছ কাটা স্থগিতকরণ, বাস্তুতান্ত্রিক সংকটময় এলাকা ঘোষণা করা, বিশেষ জীববৈচিত্র্য অঞ্চল সৃষ্টি এবং দুইটি 'শকুন সেফ জোন' তৈরি করা। জীববৈচিত্র্য রক্ষায় প্রয়োজনীয় কার্যক্রমগুলোর কার্যকর বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

১৫.১ এসডিজি-১৫ তে বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন

১৫.১.১ মোট ভূমির তুলনায় বনভূমির পরিমাণ

২০১৫ সালের হিসাব অনুযায়ী, বাংলাদেশের মোট বনভূমির পরিমাণ প্রায় ২.৫৮ মিলিয়ন হেক্টর, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১৭.৫ ভাগ। বাংলাদেশ উপকূলীয় অঞ্চলের বিস্তৃত পতিত অঞ্চলকে বনায়নের আওতায় নিয়ে আসতে সফল হয়েছে। বর্তমানে প্রায় ১৪০,০০০ হেক্টর ভূমি ম্যানগ্রোভ বনায়নের অধীনে রয়েছে। উপকূলীয় বনায়ন কর্মসূচী আরো অধিক পরিমাণে ভূমি বনায়নের আওতায় নিয়ে আসার কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করেছে।

১৫.১.২ বাস্তুতন্ত্রের ধরণ অনুযায়ী সংরক্ষিত এলাকার তুলনায় স্থলজ ও মিঠা পানির জীববৈচিত্র্যের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অনুপাত

বাংলাদেশে বর্তমানে প্রায় ৪০টি সংরক্ষিত এলাকা রয়েছে। সরকার ২০১০ সাল থেকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং তাদের আবাস হিসেবে মোট ২১টি অঞ্চলকে সংরক্ষিত এলাকা (৭টি জাতীয় উদ্যান, ১২টি বন্যপ্রাণী অভয়াশ্রম, ১টি সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকা এবং একটি বিশেষ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এলাকা) হিসেবে ঘোষণা করেছে। দেশের মোট ৩৮টি সংরক্ষিত অঞ্চলের বিস্তৃতি মোট বনভূমির প্রায় ১০.৫৫ শতাংশ, যা দেশের মোট আয়তনের প্রায় ১.৮ ভাগ। ২০১৫ সালে স্থলজ বাস্তুতন্ত্রের ১.৭ শতাংশ সংরক্ষিত এলাকার আওতাভুক্ত ছিল, যা ২০১৮ সালে উন্নীত হয়েছে ৩.০৮ শতাংশে।

১৫.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

বনভূমির লক্ষ্য অর্জনে প্রধান প্রতিবন্ধকতাসমূহ হলো– বনভূমির সুস্পষ্ট সীমা সম্পর্কে সঠিক তথ্য না থাকা এবং বনভূমির দৃশ্যমান সীমানা নির্ধারণ, ভূমি সংক্রান্ত মামলা নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে দীর্ঘসূত্রিতা, বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য ক্রমবর্ধমান কাঠের চাহিদা ইত্যাদি।

উপরোক্ত চ্যালেঞ্জগুলোর পাশাপাশি সাম্প্রতিক সময়ে মায়ানমার থেকে আগত রোহিঙ্গা শরণার্থীরা কক্সবাজার, টেকনাফ অঞ্চলের বনভূমির ওপর ভীষণ চাপ সৃষ্টি করছে। এরইমধ্যে বন বিভাগের নিয়ন্ত্রণে থাকা প্রায় ৬০০০ একর বনভূমি শরণার্থীদের অস্থায়ী বসবাসের জন্য বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে। শরণার্থীরাও রান্নাবান্নার জন্য বনের কাঠ কেটে নিচ্ছে, যা এ অঞ্চলের বনসম্পদকে মারাত্মকভাবে ব্যহত করছে; কমিয়ে দিচ্ছে বনসম্পদের পরিমাণ।

সুন্দরবনের দক্ষিণে প্রতিবছর আয়োজিত রাশমেলার সময় বিপুল সংখ্যক মানুষের অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশ বন্যপ্রাণীর আশ্রয়স্থলের জন্য একটি মারাত্মক হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাছাড়া বৃক্ষ নিধন (লগিং), স্থলজ প্রাণী শিকার ও হত্যা এবং অধিক পরিমাণে স্থলজ বৃক্ষ সংগ্রহও অন্যতম হুমকি।

১৫.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

বর্তমানে বাংলাদেশে বনাঞ্চলে বৃক্ষের ঘনত্ব যে সন্তোষজনক নয়, এই বিষয়টি বুঝতে পেরে ৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বৃক্ষের ঘনত্ব ৭০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। পরিকল্পনায় বনকৌশলের মধ্যে আছে প্রাকৃতিক বনে গাছ কাটা নিষিদ্ধকরণ, বিদ্যমান বনগুলোতে গাছের ঘনত্ববৃদ্ধি, 'এসিসটেড ন্যাচারেল রিজেনারেশন'-এর মাধ্যমে পুরনো বৃক্ষারোপিত এলাকা এবং উপকূলীয় অঞ্চলে বৃক্ষরোপন কর্মসূচি জোরদার করা।

এই পরিকল্পিত সময়ের মধ্যে প্রায় ৫০,০০০ হেক্টর পাহাড়ী বন এবং ৫০০০ হেক্টর সমতল ভূমির বনায়ন করা হবে। বৃক্ষরোপনের উৎপাদনশীলতা বিভিন্নভাবে বৃদ্ধি করতে হবে এবং বনাঞ্চলের ভূমির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করতে নানামুখী কাজে ব্যবহৃত হয় এমন বৃক্ষের প্রতি বিশেষ গুরুত্বারোপ করতে হবে।

উপকূলীয় অঞ্চলে বিদ্যমান বনায়ন ও বৃক্ষরোপন কর্মসূচি চালু রাখতে হবে। উপকূলীয় অঞ্চলে সবুজ বেষ্টনী কার্যক্রম আরো শক্তিশালী করতে বিদ্যমান কর্মসূচী একইরকম গুরুত্বের সাথে চালু রাখতে হবে। এই অঞ্চলগুলোতে প্রায় ৩০,০০০ হেক্টর ভূমিতে বৃক্ষরোপন ও পুনঃরোপন করা হবে।

এসডিজি ১৬: টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজব্যবস্থার প্রচলন, সকলের জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সকল স্তরে কার্যকর, জবাবদিহিতাপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান বিনির্মাণ

বাংলাদেশ সরকার বেশকিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলে মানব পাচার এবং যুবকদের মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন উল্লেখযোগ্য হারে হ্রাস পেয়েছে। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ খাতেও যথেষ্ট উন্নতি সাধন হয়েছে।

শান্তি ও ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার জন্য বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যার মধ্যে বিভিন্ন ধরণের অপরাধ সম্পর্কিত বিস্তৃত ও হালনাগাদ তথ্যের অভাব, আইনের যথাযথ প্রয়োগের অপর্যপ্ততা এত বেশি পরিমাণের বিচারকার্য পরিচালনা করতে বিচার বিভাগের সক্ষমতার অভাব এবং সহিংসতা/অপরাধের ঘটনার সময়মত প্রতিবেদনের অভাব অন্যতম।

কার্যকর ও জবাবদিহিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়তে এবং জনসেবাতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াই করতে সরকার, প্রশাসন সম্পর্কিত বেশকিছু উদ্যোগ বাস্তবায়ন করছে। যেমন, বার্ষিক পারফরম্যান্স চুক্তি (এপিএ), সিটিজেন চার্টার, জাতীয় সততা কৌশল (এনআইএস), এবং অভিযোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা (জিআরএস)। এই উদ্যোগসমূহ ভবিষ্যতে আরও বেশি জবাবদিহিমূলক এবং দুর্নীতিমুক্ত সরকারি প্রতিষ্ঠান সুনিশ্চিত করবে। মানবাধিকার ও ন্যায়বিচার, স্বচ্ছতা এবং বাজারে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ নিশ্চিত করতে সরকার মানবাধিকার কমিশন, তথ্য কমিশন এবং প্রতিযোগিতা কমিশনও প্রতিষ্ঠা করেছে।

১৬.১ এসডিজি-১৬ তে বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন

১৬.১.১ জেন্ডার ও বয়সভেদে প্রতি ১০০,০০০ জনে পরিকল্পিত খুনের শিকার এমন মানুষের সংখ্যা

২০০৩-২০১৪ সময়ের মধ্যে বাংলাদেশে পরিকল্পিত খুনের হারে তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি (প্রতি ১০০,০০০ জনে শিকার ২.৭)। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী ২০১৫ সালে এই হার কমে ১.৮ জনে নেমে এসেছে, যারমধ্যে ১.৪ জন হলো পুরুষ এবং ০.৪ জন নারী। আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর বলিষ্ঠ পদক্ষেপ এবং আইন ও শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন সহিংসতার হার কমিয়ে আনতে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। ফলে ২০১৭ সালে পরিকল্পিত খুনের হার আরও কমে নেমে এসেছে ১.৬৫ (এমওএইচএ, ২০১৮)। বিগত কয়েক বছরে এই সূচকে বার্ষিক গড় হ্রাসের হার চিত্তাকর্ষক, ৪.২৬ শতাংশ।

সারণি ১৬.১: পরিকল্পিত খুনের শিকার এমন ব্যক্তিদের সংখ্যা

সূচক	২০১০	ভিত্তি বছর (২০১৫)	২০১৭	মাইলফলক ২০২০
১৬.১.১ জেন্ডার ও বয়সভেদে প্রতি ১০০,০০০ জনে পরিকল্পিত খুনের শিকার এমন মানুষের সংখ্যা	২.৬	সর্বমোট: ১.৮ পুরুষ: ১.৪ নারী: ০.৪	সর্বমোট: ১.৬৫ পুরুষ: ১.২৩ নারী: ০.৪২	সর্বমোট: ১.৬ পুরুষ: ১.৩ নারী: ০.৩

উৎস: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়,বিভিন্ন বছর

১৬.১.৩ পূর্ববর্তী ১২ মাসে শারীরিক, মানসিক ও যৌন সহিংসতার শিকার জনসংখ্যার অনুপাত

নারীর প্রতি সহিংসতা জরিপ-২০১৫ অনুযায়ী, জীবনের কোনো না কোনো সময়ে বিয়ে হয়েছে এমন নারীদের মধ্যে প্রায় ৫৭.৭ শতাংশ তার স্বামী কর্তৃক যেকোনো প্রকারের সহিংসতার শিকার হয়। বিগত ১২ মাসে যেকোনো প্রকারের সহিংসতার শিকার হওয়া নারীদের অনুপাত ৩৮.০ শতাংশ, এটা কমতির দিকে।

১৬.১.৪ নিজ এলাকায় একা চলাফেরায় নিরাপদবোধ করে এমন জনগোষ্ঠীর অনুপাত

নাগরিক উপলব্ধি খানা সমীক্ষা (সিপিএইচএস) ২০১৮ অনুসারে, ৮৫.৮৫ শতাংশ লোক নিজ এলাকার চারপাশে একা চলা নিরাপদ বোধ করেন, যার মধ্যে ৮৭.৮৮ শতাংশ পুরুষ এবং ৮৩.৭১ শতাংশ নারী। এমআইসিএস ২০১৯ অনুসারে, ১৫-৪৯ বছর বয়সী ৭৪.৮ শতাংশ নারী নিজ এলাকায় একা হাঁটতে নিরাপদ বোধ করেন।

১৬.২.২ জেন্ডার, বয়স ও শোষণের ধরন ভেদে, প্রতি ১০০,০০০ জনে মানবপাচারের শিকার এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা

২০১৭ সালের হিসাব অনুযায়ী, মানবপাচারের শিকার এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বর্তমানে প্রতি ১০০,০০০-এ ০.৫৮ এ দাঁড়িয়েছে, যা ২০১৫ সালে ছিল ০.৮৫। ২০১৫-২০১৭ সময়ে মানব পাচারের শিকার মানুষের সংখ্যা রেকর্ড বার্ষিক গড়ে ১৭.৪ শতাংশ হারে কমেছে।

সারণী ১৬.২: মানব পাচার এবং যৌন সহিংসতার শিকার মানুষের সংখ্যা

সূচক	ভিত্তিবছর	(২০১৫)	২০১৮ মাইলফলক ২০২০
জেন্ডার, বয়স ও শোষণের ধরন ভেদে, প্রতি ১০০,০০০ জনে মানবপাচারের শিকার এমন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা	(পুরুষঃ০.৫৩ নারীঃ ০.৩২)	০.৫৮ (পুরুষঃ০.৩৬ নারীঃ ০.২২)	০.৫

উৎস : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ২০১৮

১৬.৩.১ কোন উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ বা সরকারিভাবে স্বীকৃত অন্য কোন বিরোধ নিষ্পত্তিকারী সংস্থার নিকট বিগত ১২ মাসে সহিংসতার শিকার হবার অভিজ্ঞতা উল্লেখপূর্বক অভিযোগ প্রদানকারীর অনুপাত

২০১৫ সালে সঙ্গী কর্তৃক সহিংসতার শিকার হওয়া ৭২.৭ শতাংশ নারী তাদের সাথে ঘটা সহিংসতার কথা কারো নিকট অভিযোগ করেনি। মাত্র ২.১ ভাগ নারী স্থানীয় নেতৃবৃন্দের নিকট হাজির হয়ে অভিযোগ করেছে এবং মাত্র ১.১ শতাংশ নারী সহিংসতার ঘটনায় পুলিশের সাহায্য চেয়েছে। তবে ২০১৫ সাল থেকে এক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০২০ সালের মধ্যে বার্ষিক ৩৭,০০০ উপকারভোগীকে আইনি সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্য ঠিক করা থাকলেও, ২০১৭ সালে প্রায় ৮০,০০০ উপকারভোগীকে আইনি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। এমআইসিএস ২০১৯ অনুসারে, সহিংসতার শিকার হওয়া নারীদের ১০.৩ শতাংশ পুলিশে রিপোর্ট করেছেন।

১১৬.৩.২ জেলে বন্দী মোট জনসংখ্যার তুলনায় বিনাদণ্ডে আটক বন্দীর সংখ্যার অনুপাত

এই সূচক মামলার চূড়ান্ত ফয়সালা এবং একটি কার্যকর বিচার ব্যবস্থার প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে সামগ্রিক বিচার বিভাগের সক্ষমতা মূল্যায়নে সহায়তা করে। প্রাপ্ত তথ্যমতে, বর্তমানে বাংলাদেশে বিনা দণ্ডে আটককৃত বন্দীদের অনুপাত অনেক বেশি (প্রায় ৮৩.৬০ শতাংশ, ২০১৮), ২০৩০ এর লক্ষ্য থেকে যা প্রায় দ্বিগুণ বেশি।

১৬.৫.১ বিগত ১২ মাসে কোন সরকারি কর্মচারি বা কর্মকর্তার সাথে অন্তত একবার যোগাযোগ হয়েছে এবং তাকে ঘুষ প্রদান করেছে, অথবা ঐ তাদের পক্ষ থেকে ঘুষ দাবি করেছে, এমন মানুষের অনুপাত

নাগরিক উপলব্ধি খানা সমীক্ষা (সিপিএইচএস) ২০১৮ অনুসারে, বিগত ১২ মাসে কোন সরকারি কর্মচারি বা কর্মকর্তার সাথে অন্তত একবার যোগাযোগ হয়েছে এবং তাকে ঘুষ প্রদান করেছে অথবা তাদের পক্ষ থেকে ঘুষ দাবি করেছে, এমন মানুষের হার ৩১.৩২ শতাংশ।

১৬.৬.২ সরকারি সেবার সর্বশেষ অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্ট জনসংখ্যার অনুপাত

নাগরিক উপলব্ধি গৃহস্থালী জরিপ (সিপিএইচএস) ২০১৮ অনুসারে, ৩৯.৬৯ শতাংশ জনগণ সরকারি সেবার সর্বশেষ অভিজ্ঞতায় সন্তুষ্ট ।

১৬.৯.১ বয়স অনুযায়ী, কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জন্ম নিবন্ধনকৃত অনূর্ধ-৫ বছর বয়সী শিশুদের অনুপাত

এমআইসিএস ২০১৯ অনুযায়ী, কোন সরকারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জন্ম নিবন্ধনকৃত অনূর্ধ-৫ বছর বয়সী শিশুদের হার ৫৬.২ শতাংশ, যা ২০১২-১৩ সালে ছিল ৩৭ শতাংশ। গ্রামাঞ্চলে জন্ম নিবন্ধনকৃত অনূর্ধ-৫ বছর বয়সী শিশুদের হার (৫৬.৮), শহরাঞ্চলের (৫৪.০) তুলনায় বেশি।

১৬.১০.২ জনসাধারণের তথ্যের অধিকার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সাংবিধানিক, সংবিধিবদ্ধ এবং/অথবা নিশ্চয়তামূলক নীতিমালা গ্রহণ ও বাস্তবায়নকারী দেশের সংখ্যা

বাংলাদেশে তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ পাশ হয়েছে। এই আইন অবাধ তথ্য প্রবাহ এবং জনগণের তথ্য অধিকার নিশ্চিতকরণে কাজ করে। চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেক ও বাক স্বাধীনতা জাতীয় সংবিধানে একটি মৌলিক অধিকার হিসেবে স্বীকৃত এবং তথ্য অধিকার এরই একটি অংশ। এই আইনের আওতায় একটি স্বাধীন তথ্য কমিশনও গঠন করা হয়েছে।

১৬.ক.১ প্যারিস চুক্তির সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার প্রতিষ্ঠানের সরব উপস্থিতি

জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আইন ২০০৯-এর ধারা অনুযায়ী, দেশে একটি সংবিধিবদ্ধ স্বাধীন জাতীয় মানবাধিকার কমিশন প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠান গঠণের উদ্দেশ্য হলো মানুষের মর্যাদা ও সততার নিশ্চয়তা বিধান করার পাশাপাশি গণতন্ত্রের মৌলিক নীতি আদর্শের নিরাপত্তা বিধান করা, যাতে করে সকল মানুষের ক্ষেত্রে অবিচ্ছেদ্য মৌলিক মানবাধিকার সুরক্ষিত থাকে এবং দেশে মানবাধিকারের মান উন্নয়ন ঘটে। শিশু বিবাহ প্রতিরোধ আইন- ২০১৭ গ্রহণে মানবাধিকার কমিশন সহায়ক ছিলো।

১৬.খ.১ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনে নিষিদ্ধ বৈষম্যমূলক আচরণ দ্বারা বিগত ১২ মাসে ব্যক্তিগতভাবে বৈষম্য ও হয়রানির শিকার হতে হয়েছে মনে করেন এমন অভিযোগ উত্থাপনকারী জনগোষ্ঠীর অনুপাত

নাগরিক উপলব্ধি খানা সমীক্ষা (সিপিএইচএস) ২০১৮ অনুসারে, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনের অধীনে নিষিদ্ধ বৈষম্যের ভিত্তিতে বিগত ১২ মাসে ৩৫.৫ শতাংশ জনগণ ব্যক্তিগতভাবে বৈষম্য বা হয়রানি বোধ করেছে বলে জানিয়েছেন। এমআইসিএস ২০১৯ অনুযায়ী, বিগত ১২ মাসে ১৫-৪৯ বছর বয়সের মহিলাদের ১০.৫ শতাংশ ব্যক্তিগতভাবে বৈষম্য বা হয়রানির শিকার হয়েছেন বলে জানিয়েছেন (একই সুচক ১০.৩.১ এও ব্যবহৃত হয়েছে) ।

১৬.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

বিভিন্ন অপরাধের ওপর পর্যাপ্ত ও হালনাগাদকৃত তথ্যের অভাবে এসব অপরাধ নিয়ন্ত্রণে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ ও পরিচালন কঠিন হয়ে পড়ে। তবে নির্ভরযোগ্য তথ্যনির্ভর একটি দক্ষ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করা গেলে এই অবস্থার উন্নতি ঘটবে।

আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং তাদের কার্যকর জবাবদিহিতামূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে এ অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন ঘটতে পারে। সংশ্লিষ্ট এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে কার্যকর বিচার বিভাগের সুবিধা নিশ্চিতকরণ এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। প্রয়োজনীয় জনবল ও প্রযুক্তিগত সম্পদের ঘাটতির কারণে বিচার বিভাগ দ্রুত বিচার নিষ্পত্তিকরণে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার অভিযোগ, বিশেষ করে পারিবারিক সহিংসতা এবং নারীর প্রতি সহিংসতা এদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা। প্রকৃতপক্ষে সহিংসতা প্রতিরোধ, হুমকির ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তির নিরাপত্তা, ক্ষতিগ্রস্থদের সহায়তা এবং অপরাধীদের দ্রুত জবাবদিহিতার আওতায় নিয়ে আসতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট সময়মত অভিযোগ করা জরুরি।

১৬.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

নারীর বিরুদ্ধে শারীরিক, মানসিক বা যৌন সহিংসতা প্রতিরোধে সর্বাত্মক ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি। বিশেষত দরিদ্রতম পরিবারগুলির মধ্যে শারীরিক, মানসিক বা যৌন সহিংসতার শিকার নারীদের অনুপাত অত্যাধিক বলে প্রতীয়মান হয়। তাই আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি ও স্থানীয় প্রতিনিধির অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

এসডিজি ১৭: টেকসই উন্নয়নের জন্য বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব উজ্জীবিতকরণ ও বাস্তবায়নের উপায়সমূহ শক্তিশালী করা

এ যাবৎ প্রাপ্ত উপাত্ত অনুযায়ী, এসডিজির এই অভিষ্ট বাস্তবায়নে বাংলাদেশ সঠিক পথে রয়েছে। করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি এবং দূরদর্শী কর সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিসহ সরকারের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের কারণে রাজস্ব আনুমানিক হারের চেয়েও বেশি পরিমাণে বেড়েছে। সরকারি উন্নয়ন সহায়তার প্রাপ্ত তথ্য দেখায় যে, এক্ষেত্রে পরিমিত প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে, যদিও সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মোট জাতীয় বাজেটে এর অবদান প্রান্তিকভাবে কমে গেছে। এফডিআই এবং রেমিটেন্স অন্তঃপ্রবাহ উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি হওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য সূচক যেমন– ইন্টারনেট সুবিধা এবং ইন্টারনেট সেবা ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা সাম্প্রতিক সময়ে ব্যাপক হারে বেড়েছে। অপটিকস ক্যাবল নেটওয়ার্কের বিস্তার এবং অপটিক্যাল ফাইবারের সক্ষমতা বৃদ্ধি এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে ভূমিকা পালন করে চলেছে।

প্রকৃতপক্ষে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টগুলোর অর্জন নির্ভর করে বৈদেশিক সম্পদসহ সব ধরনের সম্পদের যথাযথ লভ্যতার ওপর। এসডিজির ১৬৯টি লক্ষ্যের মধ্য থেকে ৬০টি লক্ষ্য অর্জনে বর্ধিত আন্তর্জাতিক সাহায্য এবং সহযোগিতার প্রয়োজনীয়তার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট যথাযথভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের উচিত এসডিজির মতো একটি সমন্বিত এবং সর্ববেষ্টিত এজেন্ডা বাস্তবায়নে বাংলাদেশকে সময়মত পর্যাপ্ত সহায়তা দান করা ।

১৭.১ এসডিজি-১৭ তে বাংলাদেশের অগ্রগতি মূল্যায়ন

১৭.১.১ উৎস অনুযায়ী জিডিপিতে মোট সরকারি রাজস্বের অনুপাত

কর-রাজস্ব এবং কর-বহির্ভূত রাজস্ব মিলিয়ে ২০১৬-১৭ সালে সরকারি রাজস্ব মোট জিডিপির প্রায় ১১.১ শতাংশ। জিডিপিতে কর রাজস্বের শেয়ার আগের বছরের ৯.৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১০.৩ শতাংশ হয়েছে এবং বৃদ্ধির পেছনে কাজ করেছে মূলত নিবন্ধিত করদাতার সংখ্যা বৃদ্ধি, কর রাজস্ব আহরণের পরিমাণ বৃদ্ধি এবং দূরদর্শী কর আহরণ ও ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি। দেশে বর্তমানে মোট সরকারি রাজস্বের প্রায় ৮৫ ভাগই আসে কর-রাজস্ব থেকে এবং সাম্প্রতিক সময়ে বাজেটে এ খাতের অবদান বেড়েছে।

সারণি ১৭.১: অভ্যন্তরীণ কর দিয়ে অভ্যন্তরীণ বাজেট অর্থায়নের অনুপাত (%)

সূচক	ভিত্তি-বছর (২০১৫)	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
জিডিপির অনুপাতে মোট সরকারী রাজস্ব	৯.৬ (এফডি, অর্থবছর ১৫)	১০.২৬	১১.১	১১.৬০
অভ্যন্তরীণ রাজস্বে অভ্যন্তরীণ বাজেট অর্থায়নের অনুপাত	৬৩ (এফডি, অর্থবছর১৫)	৬০.৬	৬৬.৪	৬২.৫০

উৎস: বাংলাদেশ অর্থনৈতিক সমীক্ষা, বিভিন্ন বছর, অর্থ মন্ত্রণালয়

১৭.৩.১ মোট অভ্যন্তরীণ বাজেটের অনুপাত হিসেবে বৈদেশিক প্রত্যক্ষ বিনিয়োগ, সরকারি উন্নয়ন সহায়তা ও দক্ষিণ-দক্ষিণ সহযোগিতার পরিমাণ

২০১৭-১৮ সালে বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তা ছিল ৬.২৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যা আগের বছরের তুলনায় প্রায়৭০ শতাংশ বেশি। এফডিআই এর পরিমাণ ২০১৮ সালে ৩.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে, যা জাতীয় বাজেটের ৭.৯ শতাংশ।

সারণি ১৭.২: বার্ষিক বাজেটে সরকারি উন্নয়ন সহায়তা

	২০০৯-১০	২০১৪-৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮
বাজেট (বিলিয়ন ইউএসডি)	১৮.২৭	৩৩.৮১	৩৩.৮০	৩৩.৮৬	৪৫.২৫
ওডিএ (বিলিয়ন ইউএসডি)	১.৭৮	৩.০১	৩.৫৩	৩.৬৮	৬.২৯
অভ্যন্তরীণ বাজেটের শতাংশ হিসাবে ওডিএ	৯.৭	৮.৯	৯.৬	১০.৯	১৩.৮১

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়

১৭.৩.২: মোট জিডিপির অনুপাতে রেমিটেন্সের পরিমাণ (মার্কিন ডলারে)

২০১০ সাল থেকে রেমিটেন্সের বার্ষিক প্রবাহ ধারাবাহিকভাবে বাড়ছে এবং ২০১৫ সালে সর্বোচ্চ প্রায় ১৫.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌছায়। কিন্তু পরবর্তী দুই বছরে এর পরিমাণ অনেকটাই নিচে নেমে এসেছে। জিডিপির অনুপাতে রেমিটেন্স প্রবাহের এই নিম্নগামী হার সবচেয়ে শোচনীয় অবস্থায় পৌছায় ২০১৭ সালে।

সারণি ১৭. ৩: জিডিপিতে রেমিট্যান্স এর অনুপাত

সূচক	*অর্থবছর ২০১০*	*অর্থবছর ২০১২*	*অর্থবছর ২০১৩*	*অর্থবছর ২০১৪*	*অর্থবছর ২০১৫*	*অর্থবছর ২০১৬*	*অর্থবছর ২০১৭*	*অর্থবছর ২০১৮*
রেমিট্যান্স (বিলিয়ন ইউএস ৳)	১০.৮৫	১২.৮	১৪.৫	১৪.২	১৫.৩	১৪.৯	১২.৮	১৪.৯৮
জিডিপির অংশ হিসাবে রেমিট্যান্স (%)	৮.৪	৯.৬	৯.৭	৮.২	৭.৯	৬.৭	৫.১	৫.৪৬

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়

১৭.৪.১ দ্রব্যসামগ্রী ও সেবা রপ্তানির অনুপাত হিসেবে ঋণ সেবা

সাম্প্রতিক বছরগুলোতে ঋণসেবা বোঝার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে। ২০১২ সালে ঋণের বোঝা ছিল প্রায় ৭ শতাংশ, ২০১৮ অর্থবছরে যা নেমে আসে ৩.৮৪ শতাংশে। ঋণ পরিশোধ পরিস্থিতির চিত্তাকর্ষক উন্নতিতে দুটো উপাদান কাজ করেছে- একদিকে নিম্ন সাহায্য প্রবাহ ও অন্যদিকে অব্যাহত রপ্তানি বৃদ্ধি।

সারণি ১৭.৪: রপ্তানির অনুপাতে ঋণ পরিশোধ

সূচক	অর্থবছর ২০১২	অর্থবছর ২০১৩	অর্থবছর ২০১৪	অর্থবছর ২০১৫ (ভিত্তিবছর)	অর্থবছর ২০১৬	অর্থবছর ২০১৭	অর্থবছর ২০১৮
দ্রব্য ও সেবা রপ্তানির অনুপাতে ঋণ পরিশোধ (শতাংশ)	৭.০	৮.৬	৬.৪	৫.১২	৪.৬	৩.২৪	৩.৮৪

উৎস: অর্থ মন্ত্রণালয়

১৭.৬.২ গতি ভেদে প্রতি ১০০ বাসিন্দার মধ্যে স্থায়ী ব্রডব্যান্ড গ্রহীতার সংখ্যা

২০১৭ সালে প্রতি ১০০ জনে ইন্টারনেট সেবা গ্রহণকারীর সংখ্যা হিসাব করা হয়েছে ৪.৪৬ শতাংশ; ২০১৪ সালের তুলনায় যা প্রায় দ্বিগুণেরও বেশি। ২০১০ সাল থেকে ২০১৫ সময়ের মধ্যে ইন্টারনেট সেবা গ্রহণের হার বেড়েছে বার্ষিক গড়ে প্রায় ৫৪.৯ শতাংশ এবং ২০১৬-১৭ সময়ের মধ্যে ১৮.৩০ শতাংশ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে।

সারণি ১৭.৫: স্থায়ী ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড গ্রহণ

	২০১০	২০১২	২০১৩	২০১৪	ভিত্তি বছর ২০১৫	২০১৬	২০১৭
গতি ভেদে প্রতি একশত বাসিন্দার স্থায়ী ইন্টারনেট ব্রডব্যান্ড গ্রহণ	০.২৭	০.৩৯	০.৯৭	১.৯৫	২.৪১ (বিটিআরসি, ২০১৫)	৩.৭৭	৪.৪৬

উৎস: ডব্লিউডিআই, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ২০১৭, এবং বিটিআরসি

১৭.৮.১ ইন্টারনেট ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা

দেশে ইন্টারনেট ব্যবহাকারী মানুষের সংখ্যা ২০১০ সালের ৩.৭ শতাংশ থেকে ব্যাপকভাবে বেড়ে ২০১৫ সালে দাঁড়িয়েছে প্রায় ৩০.৩৯ শতাংশে। এই নতুন যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারকারী মানুষের সংখ্যা খুব দ্রুত গতিতে বেড়ে ২০১৭ সালে পৌছে গেছে প্রায় ৫০ শতাংশে।

সারণি ১৭.৬: ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর অনুপাত (%)

সূচক	২০১০	২০১২	২০১৩	২০১৪	ভিত্তি-বছর ২০১৫	২০১৬	২০১৭
ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর ব্যক্তির অনুপাত	৩.৭	৫.০	৬.৬	১৩.৯	৩০.৩৯ (বিটিআরসি,২০১৫)	৪১.৪	৪৯.৫

উৎস: ডব্লিউডিআই, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ২০১৭, এবং বিটিআরসি

১৭.৯.১ অঙ্গীকার অনুযায়ী উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মার্কিন ডলারে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার মূল্য (উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ ও ত্রিমাত্রিক সহযোগিতার মাধ্যমে সহ)

গত চার বছরে বাংলাদেশের কাছে প্রতিশ্রুত আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহায়তা বেশ উঠানামা করেছে। ২০১৭ সালে তা ১২.৪৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫৯৬.৭৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে।

সারণি ১৭.৭: প্রতিশ্রুত সহায়তা (মিলিয়ন মার্কিন ডলার)

সূচক	২০১২	২০১৩	২০১৪	ভিত্তি-বছর ২০১৫	২০১৬	২০১৭
উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মার্কিন ডলারে আর্থিক ও কারিগরি সহায়তার মূল্য (উত্তর-দক্ষিণ, দক্ষিণ-দক্ষিণ ও ত্রিমাত্রিক সহযোগিতার মাধ্যম সহ)	৫৮৮.০	৭২৬.৩	৬৮০.৭	৫৭০.৮	৫৩০.৬	৫৯৬.৭৩

উৎস : ইআরডি ২০১৮

১৭.১২.১ উন্নয়নশীল, স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রকে যে গড় শুল্কহার দিতে হয়েছে।

২০১১ সালে উন্নত দেশ কর্তৃক বাংলাদেশের কৃষিজাত দ্রব্য এবং বস্ত্র ও পোশাক খাতে আরোপিত গড় শুল্কহার ছিল ০-৯ শতাংশের মধ্যে, যা ২০০৫ সালের ১২ শতাংশ থেকে অনেকটা কম। এই সূচক স্পষ্ট করে যে, আমদানিকারক দেশে আরও বাণিজ্য উদারিকরণ হলে বাংলাদেশ ২০৩০ সালের মধ্যেই এসডিজির অনেক লক্ষ্যে পৌছে যাবে।

সারণি ১৭.৮: গড় পড়তা শুল্ক হার

সূচক	২০১০	ইধংবষরহব [২০১৫]	২০১৬
উন্নয়নশীল ও স্বল্পোন্নত দেশ ও উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র দ্বীপরাষ্ট্রকে প্রদত্ত গড় শুল্কহার	১২%	ক) এমএফএন: ৮.২৫ খ) প্রাধিকারমূলক: ৩.৮৮% (এমওসি, ২০১৪)	ক) এমএফএন: বাংলাদেশের জন্য (১০.৫%) এমএফএন (১৩.২৫%) ভারকৃত শুল্ক খ) প্রাধিকারমূলক: ৯.৪৭%

উৎস : এমওসি, এসআইআর, ২০১৮

১৭.১৯.২ (ক) গত ১০ বছরে অন্তত একটি আদমশুমারি ও আবাসনশুমারি সম্পন্ন হয়েছে এবং (খ) শতভাগ জন্মনিবন্ধনসহ ৮০ ভাগ মৃত্যুনিবন্ধন কাজ সম্পন্ন হয়েছে এমন দেশের অনুপাত

২০০৪ সালে বাংলাদেশ "জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন আইন, ২০০৪" চালু করে, ২০০৬ সালে যা বাস্তবায়ন শুরু হয়। নিবন্ধন কার্যক্রম আরো টেকসই করতে ২০১৩ সালে এই আইন

আরো সংশোধন করা হয়। ২০১০ সাল থেকে অনলাইন জন্মনিবন্ধন কার্যক্রম চালু রয়েছে। এই সকল উদ্যোগ জন্মনিবন্ধন কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। ২০১৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে জন্ম নিবন্ধনকৃত জনগোষ্ঠীর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় ১৩৯.৮ মিলিয়ন, যা দেশের মোট জনগোষ্ঠীর মোটামুটি প্রায় ৮৬ ভাগ।

১৭.২ প্রধান চ্যালেঞ্জসমূহ

উন্নয়নের ক্ষেত্রে দেশের দারুণ কৃতিত্ব সত্ত্বেও এখনো অনেক চ্যালেঞ্জ রয়ে গেছে। বিশেষ করে এসডিজির লক্ষ্য অর্জনে গৃহিত বিভিন্ন পদক্ষেপসমূহ বাস্তবায়নের জন্য সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে রয়ে গেছে বড় চ্যালেঞ্জ। প্রাপ্ত বিভিন্ন তথ্য থেকে এটা স্পষ্ট যে, দেশীয় সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সম্ভাবনার সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিত হয়নি। দেশের জনগোষ্ঠীর একটি বড় অংশ এখনো কর জালের (ট্যাক্সনেট) বাইরে রয়ে গেছে। এটা সত্য যে চলতি বছরে করদাতার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে, এরপরও প্রায় দ্বিগুণ মানুষ কর জালের বাইরে রয়ে গেছে।

এদিকে আবার সংশ্লিষ্ট বিভাগে প্রয়োজনীয় লোকবল এবং কারিগরি সক্ষমতায় ঘাটতির কারণে ভ্যাট সংগ্রহ কার্যক্রম শক্তিশালী করা একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাজেট ব্যয় মেটানোর জন্য উন্নয়ন সহায়তা বৈদেশিক সম্পদের একটি বড় উৎস। সাম্প্রতিক সময়ে মোট জাতীয় বাজেটের আকারের তুলনায় বৈদেশিক উন্নয়ন সহায়তার অবদান কমে আসছে। এছাড়াও, বাংলাদেশকে উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় নাম লেখালে ভবিষ্যতে কম সুদে ঋণ প্রাপ্তি এবং বিভিন্ন সহায়তা পেতে আরো বেশি চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হবে।

এদেশে রেমিটেন্সের উৎস খুব বেশি বহুমুখী নয়। প্রচলিত বৈদেশিক শ্রম বাজারে বিভিন্ন অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ রেমিটেন্স প্রবাহ বৃদ্ধি করতে নানা প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেই চলেছে। অভিবাসী শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিষয়েও গভীর নজর দেওয়া প্রয়োজন।

১৭.৩ ভবিষ্যৎ করণীয়

সরকার বিনিয়োগের পরিবেশ উন্নয়ন ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টির পাশাপাশি ওডিএ ও এফডিআইয়ের প্রবাহ বজায় রাখতে প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে। পাশাপাশি, কর ভিত্তি বৃদ্ধি এবং রাজস্ব আদায়ের উপর আরো বেশি নজর দিতে হবে। প্রণোদনা প্রদানের মাধ্যমে ইন্টারনেটকে দেশের সর্বত্র সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী করতে হবে।

অংশ খঃ দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন এসডিজি'র কাঠামোর আলোকে

জাতিসংঘের (ইউএন) সদস্য দেশগুলি ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৫ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) এজেন্ডা গ্রহণ করে। এজেন্ডায় ১৭ টি অভীষ্ট, এবং এর সাথে সংযুক্ত ১৬৯ টি লক্ষ্যমাত্রা ও ২৩২ টি সূচক রয়েছে, যা দারিদ্র্য দূরীকরণ, ক্ষুধার অবসান, অসমতা হ্রাস; জলবায়ু পরিবর্তন এবং পরিবেশগত উন্নয়ন; স্বাস্থ্য ও শিক্ষায় অধিকতর প্রবেশগম্যতা; পৃথিবী এবং মানুষের প্রতি যত্নশীল হওয়া এবং শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং অংশীদারিত্ব গড়ার লক্ষ্যে গৃহীত হয়েছে।

২০০০ সালে গৃহীত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য (এমডিজি) এর পরবর্তী ধাপ হিসেবে এসডিজি গৃহীত হয়। তবে এসডিজি বিভিন্ন দিক এমডিজি থেকে আলাদা। এসডিজি'র অভীষ্টসমূহ নিশ্চিত করতে চায় যে 'কেউ পিছিয়ে থাকবে না'। নতুন অভীষ্টসমূহ দেশগুলিকে তাদের নিজস্ব আর্থিক সংস্থান ও সক্ষমতা ব্যবহার করতে এবং উন্নত দেশগুলির নিকট হতে যেসব ক্ষেত্রে তারা পিছিয়ে আছে সেসব ক্ষেত্রে তাদের সহায়তা চাইতে উজ্জীবিত করে। এসডিজি কেবলমাত্র পরিমাণগত নয় বরং গুনগতমানের দিকেও গুরুত্বারোপ করে। উদাহরণস্বরূপ, এমডিজি শিক্ষায় উচ্চ অংশগ্রহণের দিকে মনোনিবেশ করেছিল এবং এসডিজি গুণগত শিক্ষাকে টেকসই উন্নয়ন এবং টেকসই জীবনধারার জন্য লক্ষ্য হিসেবে নির্দিষ্ট করেছে।

বৈশ্বিক অঙ্গনে, এমডিজি, উন্নয়নের লক্ষ্যে বৈশ্বিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। তাই, এসডিজিকে একটি সুসংহত, অবিভাজ্য ও বহুমাত্রিক বৈশ্বিক লক্ষ্য হিসাবে নেয়া হয়েছে, যেখানে ইস্তাম্বুল কার্য-পরিকল্পনা এবং আদ্দিস আবাবা কর্ম এজেন্ডাকে ধারণ করা হয়েছে। যদিও, এসডিজি'র অভীষ্টসমূহের লক্ষ্যার্জনের ঝুঁকি নিয়ে সমালোচনা রয়েছে। এসডিজিতে এত বেশি বাস্তবায়নের ক্ষেত্র চিহ্নিত করা হয়েছে যে, শেষ পর্যন্ত তা একটি "অবিন্যস্তভাবে সাজানো ক্রিসমাস ট্রি" এর মত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যায়।

অর্থায়নের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার যে অগ্রগতি তা অনেকাংশে প্রতিশ্রুতি থেকে কমই রয়ে গেছে। উন্নয়নশীল দেশগুলির সামগ্রিক বৈদেশিক সাহায্য প্রাপ্তির হার-প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগ (এফডিআই) সহ-হ্রাস পেয়েছে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অনুদান, পণ্য সহায়তা ও দ্বিপক্ষীয় সহায়তার প্রবণতা হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু প্রকল্প সাহায্য এবং বহুপাক্ষিক উন্নয়ন সহায়তা বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষত, ১৯৭১-৭২ থেকে ২০১৭-১৮ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাংক এবং এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এর সাহায্যের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ছিল। এসময়ে বিশ্বব্যাংক ও এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকের সাহায্যের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৯.৭৮ বিলিয়ন ডলার এবং ১৩.৬০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। দ্বিপক্ষীয় অংশীদার হিসাবে জাপান শীর্ষস্থানীয় সাহায্যকারী দেশ, ১৯৭১-৭২ সাল থেকে এ পযর্ন্ত এককভাবে জাপানের মোট সাহায্যের পরিমাণ ১১.৩৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। জাতিসংঘ-সেক্রেটারি জেনারেল কর্তৃক প্রদত্ত অগ্রগতির প্রতিবেদনে এসডিজি এবং এসডিজি বাস্তবায়নের বর্তমান ধারা সম্পর্কে একটি হতাশাজনক দৃষ্টিভঙ্গির

প্রতিফলন ঘটেছে, যার মধ্যে ক্রমহ্রাসমান ওডিএ, এসডিজি বাস্তবায়নের সাথে বেসরকারি প্রচেষ্টাকে সঠিকভাবে সমন্বিত না করা এবং ক্রমবর্ধমান বাণিজ্য যুদ্ধ অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যা আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি কার্যক্রম অব্যাহতভাবে পরিচালনার বিষয়টিকে সামনে নিয়ে এসেছে। এসডিজি অর্জনের জন্য, প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বহিঃ সম্পদের প্রবাহ, সক্ষমতা বিকাশ, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে শক্তিশালীকরণ, স্বচ্ছতা, জনসাধারণের অংশগ্রহণ, যুব সমাজ ও কমিউনিটির জড়িত হওয়া এবং বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। বহু-অংশীদারদের অংশগ্রহণ ব্যতীত এসডিজির উচ্চাকাঙ্ক্ষার অতি সামান্যই বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

এসডিজি ১ এর মূল লক্ষ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে সব ধরণ ও মাত্রার দারিদ্র্য বিমোচন করা। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার দ্বারা দারিদ্র্য এবং সামাজিক বৈষম্য মুক্ত সমাজ গঠনের মাধ্যমে এ লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ সরকার বদ্ধপরিকর। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার বাস্তবায়ন মেয়াদ ২০১০ থেকে ২০২১ সাল। এ পরিকল্পনায় দেশের উত্তরোত্তর অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির রোডম্যাপ এবং দারিদ্র্য বিমোচনের বিস্তৃত পন্থাসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। প্রেক্ষিত পরিকল্পনার অন্তর্গত নীতিসমূহে জাতীয় প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যে অন্তর্ভুক্তিকরণ এবং দারিদ্র্য-বান্ধব পদ্ধতিসমূহের ওপর জোর দেয়া হয়েছে যাতে ভিশন ২০২১-এর লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী মধ্যম আয়ের স্থিতিতে পৌঁছানোর প্রক্রিয়ায় সামাজিক অন্তর্ভুক্তির একটি বিস্তৃত পরিকল্পনার মাধ্যমে দারিদ্র্যের সুস্পষ্ট নির্মূলকরণ হতে পারে। এছাড়া, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিধৃত কৌশলসমূহের অন্তর্নিহিত মূলনীতি হিসেবেও চরম দারিদ্র্য বিমোচনের উল্লেখ করা হয়েছে।

এসডিজি ২ এর মূল লক্ষ্য হলো ২০৩০ সালের মধ্যে চরম ক্ষুধা এবং অপুষ্টির অবসান ঘটানো। নানা প্রকার বৈশ্বিক অস্থিতিশীলতার কারণে সারাবিশ্বে ক্ষুধা জনিত দুর্ভোগে ভুক্তভোগীর সংখ্যা বেড়েছে। এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় প্রয়োজন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অংশীদারদের অংশীদারিত্বের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। ইউএনডব্লিউএফপি-এর ২০১৬ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী ক্ষুধার কারণে কর্মক্ষমতা হ্রাস পেয়ে বাংলাদেশে প্রতিবছর ১ বিলিয়ন ডলার অর্থের সমপরিমাণ সম্পদ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশ জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনায় টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা এবং এর অধীনের উল্লিখিত নির্দেশকসমূহ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম একটি উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা হলো উচ্চ পর্যায়ের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এ লক্ষ্যমাত্রা সাফল্যের সাথে অর্জনের লক্ষ্যে প্রয়োজন আন্তর্জাতিক সহযোগিতা যেমন- আন্তর্জাতিক বীজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা, কৃষিতে স্থানীয় এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ বৃদ্ধি এবং বিশ্বব্যাপী রপ্তানী ভর্তুকির অবসান। উল্লেখ্য, ইতোমধ্যেই সার্ক কর্তৃক একটি আঞ্চলিক বীজ ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। কৃষিখাতে বার্ষিক সহায়তার পরিমাণ ২০০ মিলিয়ন ডলারে স্থির থাকা সত্ত্বেও কৃষি পরিস্থিতির সূচক ২০১৬ সালে ০.৪১-তে পৌঁছেছে যা পূর্ববর্তী বছরে ০.৫৩ ছিল। এটি কৃষিখাতে পূর্ববর্তী বছরের তুলনায় কম বিনিয়োগ নির্দেশ করে।

বাংলাদেশের সফল প্রচেষ্টাসমূহের অনেকগুলোই আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে দীর্ঘসময় ধরে বাস্তবায়িত হয়েছে। সুতরাং, এটি আশা করা যায়ই যে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা প্রসার লাভ করলে তা এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাসমূহ বাস্তবায়ন এবং আগামী দশকে উত্তোরণ চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় বাংলাদেশের যাত্রাপথকে আরো সুগম করবে।
দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টি বাংলাদেশের উন্নয়ন নীতি, পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন প্রকল্প

বাস্তবায়নের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে। ষষ্ঠ ও সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মূল দর্শন হল প্রবৃদ্ধি তরান্বিতকরণ এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা। বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্য হ্রাস, মানব বিকাশের উন্নতি, জেন্ডার-সমতা অর্জন এবং বৈষম্য হ্রাস করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। বাংলাদেশ সরকার দেশের জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থান উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিকভাবে প্রচুর পরিমাণে সম্পদ বিনিয়োগ করে চলেছে। ২০০৯-এর পরে, মোট বাজেটের প্রায় অর্ধেকই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে। পাশাপাশি, বাংলাদেশ সরকার এসডিজিকে গুরুত্বসহকারে নিয়েছে কারণ এসডিজি দারিদ্র্য বিমোচনের বিষয়টিকে সর্বকালের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেছে। সরকার এসডিজিকে গুরুত্ব সহকারে নিয়েছে। বিগত দশকগুলিতে, দারিদ্র্য হ্রাস, জেন্ডার-সমতা, স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা, স্যানিটেশন ইত্যাদির ক্ষেত্রে দেশে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তবুও সরকার সচেতন যে এই অগ্রগতি যথেষ্ট নয় এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করতে প্রচুর প্রচেষ্টা এবং সম্পদ বরাদ্দ করছে যাতে করে এসডিজি অর্জন করা সম্ভব হয়।

বাংলাদেশ সরকার দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক প্রকৃতিকে স্বীকার করে এবং এর জন্যে উপযুক্ত নীতি ও কৌশল অবলম্বন করার প্রয়োজন আছে মর্মে মনে করে। গত দুইটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার উন্নয়ন নীতি এবং কৌশলগুলি মূলত দরিদ্র্যবান্ধব প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যমাত্রাকে কেন্দ্র করে প্রণীত। গত এক দশকের টেকসই প্রবৃদ্ধি দারিদ্র্য হ্রাসে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

কর্মসংস্থান, শ্রমের উৎপাদনশীলতা এবং প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধি দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। মোট কর্মসংস্থানের শক্তিশালী প্রবৃদ্ধি, শ্রমশক্তির দ্রুত বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষিতে শ্রমের বর্ধিত উৎপাদনশীলতা প্রকৃত মজুরির দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়তা করেছে। কৃষি শ্রমিকেরা সাধারণত দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীর অর্ন্তভূক্ত এবং উৎপাদনশীলতা এবং প্রকৃত মজুরির বৃদ্ধি চরম দারিদ্র্য হ্রাসের সবচেয়ে টেকসই উপায়। শ্রমঘন নগর ও পল্লী উৎপাদন ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে প্রবৃদ্ধি-কর্মসংস্থান-দারিদ্র্য হ্রাস সংযোগ দারিদ্র্য হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য সরকারের অন্তর্নিহিত দর্শন হল শিল্পকে বিশেষতঃ ম্যানুফ্যাকচারিং খাতকে উৎসাহ প্রদান করার মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা, কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে দারিদ্র্য হ্রাস করা। এর সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত অন্যান্য ক্রসকাটিং ইস্যুগুলি হলো জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিযোজন এবং প্রশমন, দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি-যা মূলত এসডিজির মূলনীতি "কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়"এর সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নিম্নোক্ত সারণীতে দেখানো হয়েছে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যহারে হ্রাস পেয়েছে, খানা আয়-ব্যয় জরিপ অনুসারে ২০০০ সালের তুলনায় দারিদ্র্যের হার অর্ধেকেরও বেশি নেমে এসেছে, যা ২০১৬ সালে ছিল ২৪.৩। সাম্প্রতিক প্রাক্কলন থেকে দেখা যায় যে, ২০১৮ দারিদ্র্য এবং চরম দারিদ্র্য যথাক্রমে ২১.৮ শতাংশ এবং ১১.৩ শতাংশে নেমে এসেছে। আমাদের লক্ষ্য ২০২০ সালের মধ্যে মৃদু দারিদ্র্যকে ১৮.৬ এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৯.৭০ এ নামিয়ে আনা।

সরকার অন্তর্ভুক্তিকে প্রবৃদ্ধি প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে সাম্যতা, সুযোগের সাম্যতা এবং বাজারে স্থিতিশীলতা এবং কর্মসংস্থান, পরিবর্তনের মাধ্যম হিসাবে বিবেচনা করে। যদি এটি সমাধান না করা হয় তবে সুযোগের অভাবে পদ্ধতিগত বৈষম্য বৃদ্ধির সম্ভাবনা থেকে যায়। সুতরাং, আয়ের চেয়ে বেশি অর্জন, সুযোগ বৃদ্ধি, উৎপাদনশীল কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং প্রান্তিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী মানুষের জন্য পরিষেবাগুলি নিশ্চিত করাকেই অন্তর্ভুক্তি হিসেবে গণ্য করা যায়।

চিত্র -১: দীর্ঘমেয়াদী দারিদ্র্যের প্রবণতা

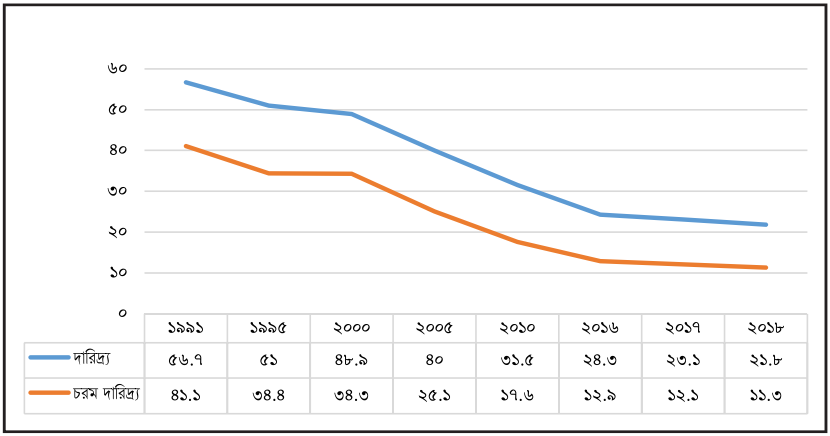

	১৯৯১	১৯৯৫	২০০০	২০০৫	২০১০	২০১৬	২০১৭	২০১৮
দারিদ্র্য	৫৬.৭	৫১	৪৮.৯	৪০	৩১.৫	২৪.৩	২৩.১	২১.৮
চরম দারিদ্র্য	৪১.১	৩৪.৪	৩৪.৩	২৫.১	১৭.৬	১২.৯	১২.১	১১.৩

অন্তর্ভুক্তি ও সাম্যতা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন ব্যবস্থা নিতে হবে যেগুলোর মধ্যে কৃষির উৎপাদনশীলতা এবং আয়ের উন্নতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা, পুষ্টি এবং নিরাপদ পানি সরবরাহ, আঞ্চলিক বৈষম্য হ্রাসে সরকারি ব্যয় বৃদ্ধি করা, উৎপাদন উপকরণ (সার, বীজ, জল, বিদ্যুত এবং গ্রামীণ রাস্তা) দরিদ্রদের জন্য সহজলভ্য করা, প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নে দরিদ্রদের প্রবেশাধিকার বাড়ানো এবং সামাজিক সুরক্ষা এবং সামাজিক বীমা খাতের ব্যয় বৃদ্ধি করা অন্যতম।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টের মূলমন্ত্র "কাউকে পশ্চাতে রেখে নয়"এ আকাঙ্ক্ষা পূরণে বাংলাদেশ সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। এসডিজি'র সামগ্রিকতার দিকটি বিবেচনায় রেখে সরকার এসডিজি বাস্তবায়ন ও অর্জনের জন্য সমগ্র সমাজকে নিয়ে "Whole of Society" এ্যাপ্রোচ গ্রহণ করেছে।

মাথাপিছু দৈনিক আনুপাতিক আয় ১.৯ মার্কিন ডলার (২০১১ সালের ক্রয় ক্ষমতা সমতা অনুযায়ী) হিসেবে আমাদের দারিদ্র্য দূরীকরণে লক্ষণীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, ২০০০ সালের ৩৪.৮ শতাংশ থেকে ২০১৬ সালে তা ১৩.৮ শতাংশে নেমে এসেছে। আমাদের লক্ষ্য রয়েছে ২০৩০ সালের মধ্যে চরম দারিদ্র্যের হার ৩ শতাংশে নামিয়ে আনা (শূন্য দারিদ্র্য)। এছাড়াও লক্ষণীয় অর্জন হলো আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী দরিদ্রের মোট সংখ্যা কমে আসা। এ সংখ্যা ২০০০ সালে ৪৫.৮ মিলিয়ন থেকে ২০১৬ সালে ২২.৫ মিলিয়নে অর্থাৎ অর্ধেকে নেমে এসেছে। দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য সরকারের ব্যাপক প্রচেষ্টা গ্রহণের পাশাপাশি এনজিও কর্তৃক গৃহীত কর্মসূচির মাধ্যমে এ অগ্রগতি সম্ভব হয়েছে।

চিত্র -২: বাংলাদেশের জন্য আন্তর্জাতিক মানের দারিদ্র্যের প্রবণতা

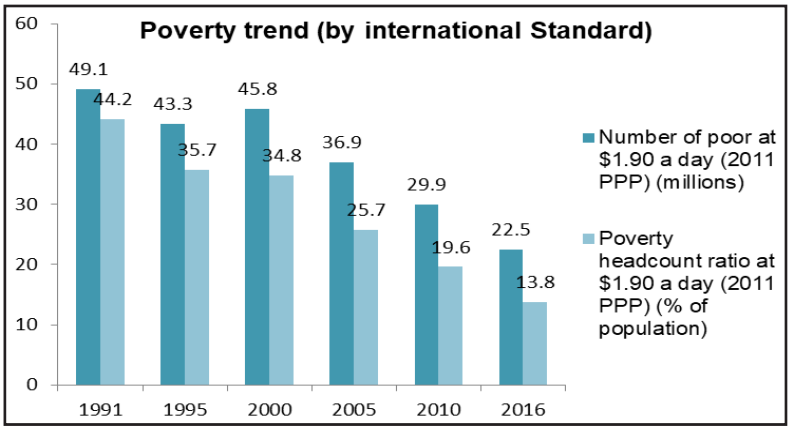

উৎস : বিশ্বব্যাংক

সরকার তাঁর নাগরিকদের সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে যাদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন আছে এমন জনগোষ্ঠীকে সহায়তা করার জন্যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহ সুসমন্বয়ের লক্ষ্যে একটি বিস্তৃত জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস) প্রণয়ন করেছে। দুস্থ মানুষ বিশেষত মহিলা, শিশু, বয়স্ক এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের এনএসএসএসএসের আওতায় যথাযথ অগ্রাধিকার প্রদান করা হয়েছে। ঝুঁকি ও দূর্দশা মোকাবেলায় দারিদ্র্যবিরোধী কৌশল হিসেবে সম্প্রসারিত সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিগুলি (এসএসএনপি) দারিদ্র্য ও বৈষম্য হ্রাস করতে সহায়তা করেছে[২]। দারিদ্র্যের সাথে লড়াই করার জন্য গত দশক ধরে এনএসএসএসএস ২০১৫ এর অধীনে সামাজিক সুরক্ষা এবং ক্ষমতায়ন কর্মসূচিকে পুনর্জীবিত করে দরিদ্রতা দূরীকরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বাজেটের ৫০% এরও বেশি বরাদ্দের প্রদান করা হয়েছে।

চিত্র-৩: দারিদ্র্য হ্রাসে বাজেট ব্যয়

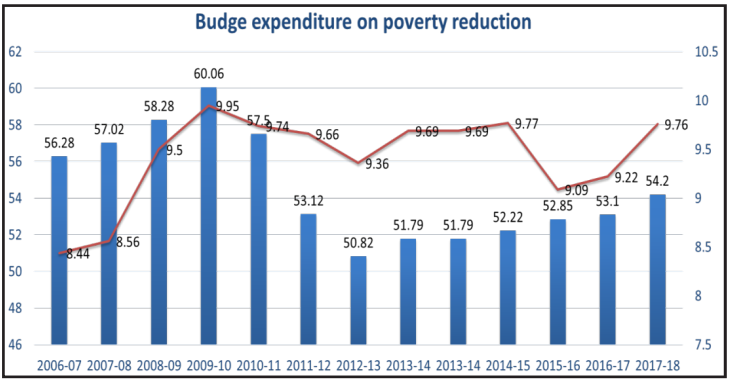

২ জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলপত্র, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, জিওবি, জুলাই ২০১৫

২০০৮ সাল নাগাদ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতাভুক্ত ছিল মোট জনসংখ্যার ১৩%। তবে, এখন প্রায় ২৭.৮০% পরিবার সরকারের যে কোনও সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির (নগদ বা অনুদান) আওতাভুক্ত। এনএসএসএস-এর আওতায় দুস্থ মানুষ বিশেষত মহিলা, শিশু এবং প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এই বরাদ্দ জিডিপি'র প্রায় ২%।

চিত্র-৪: সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচি (এসএসএনপি) ব্যয়

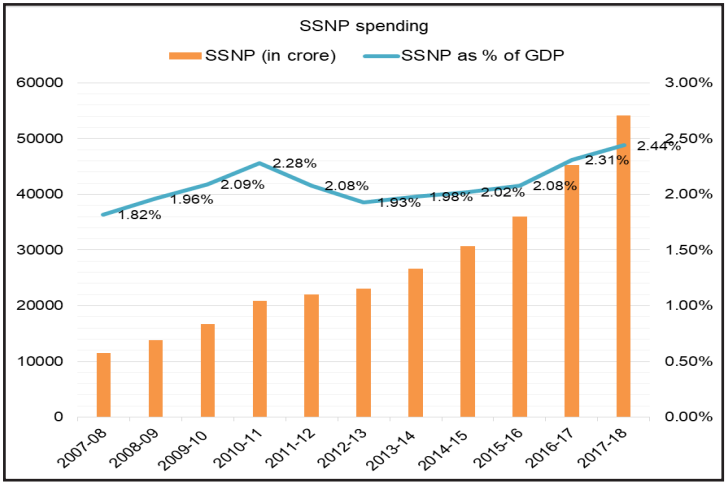

উৎস : অর্থ বিভাগ

জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশল (এনএসএসএস): বাংলাদেশ, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, বাংলাদেশ সরকার, জুলাই ২০১৫।

দারিদ্র্য নিরসনে সরকারের কৌশলসমূহ :

সরকার কর্তৃক গৃহীত উন্নয়নের বৃহত্তম চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় অনুসরণীয় কৌশলগুলি নিম্নরূপ:

১) ম্যানুফ্যাকচারিং ও পরিষেবা খাতে শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থান বৃদ্ধির মাধ্যমে প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা করা;

২) কৃষিকাজের উন্নতির মাধ্যমে খামারের আয় বৃদ্ধি করা;

৩) উৎপাদন উপকরণগুলিতে (সার, বীজ, সেচের জল, বিদ্যুৎ, গ্রামীণ রাস্তা) এবং প্রাতিষ্ঠানিক অর্থায়নে দরিদ্র্যদের প্রবেশগম্যতা বৃদ্ধি করা;

৪) অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং দক্ষ মানব সম্পদ তৈরীর জন্যে বিনিয়োগের বৃদ্ধির সাথে প্রবৃদ্ধি কেন্দ্রগুলোর সংযোগ স্থাপন মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের কর্মসংস্থানের সুযোগগুলি প্রসারিত করা;

৫) রেমিটেন্সের দারিদ্র্য-হ্রাসের প্রভাবের কারণে দরিদ্র অঞ্চল থেকে লোকজনকে বিদেশ প্রেরণে সহায়তা প্রদান;

৬) বিদেশ ফেরত অভিবাসীদের জন্য উদ্যোক্তা উন্নয়নের কর্মসূচী/ কৌশল / পদ্ধতি গ্রহণ;

৭) শ্রমশক্তিতে নারীদের অংশগ্রহণকে উদ্বুদ্ধ করা;

৮) নতুন গন্তব্যে মহিলা শ্রমিক সহ বৈদেশিক অভিবাসন উৎসাহিত করা এবং বিদ্যমান বিদেশের শ্রমবাজার সম্প্রসারণ;

৯) জন্মহার হ্রাসে বাংলাদেশের অতীত সাফল্য টেকসই করা/ধরে রাখা;

১০) মানসম্মত শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং পুষ্টি পরিষেবাদিতে দরিদ্র পরিবারের প্রবেশাধিকার বাড়ানো;

১১) সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচির সমন্বয়, লক্ষ্য এবং বিস্তৃতি জোরদার করা;

১২) ক্ষুদ্র অর্থায়নে প্রবেশাধিকার বৃদ্ধি;

১৩) খাদ্যের দাম স্থিতিশীল নিশ্চিত করা; এবং

১৪) জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব প্রশমিত করা।

১৫) মূল্যস্ফিতি নিয়ন্ত্রণে রাখা।

"একটি বাড়ি একটি খামার" প্রকল্প: দারিদ্র্য বিমোচনে এক তৃণমূল উদাহরণ

বর্তমান সরকার একটি বাড়ি, একটি খামার প্রকল্প গ্রামীণ অঞ্চলে দারিদ্র্য বিমোচন ও টেকসই উন্নয়নের জন্য আয় বর্ধক কার্যক্রমের মাধ্যমে সঞ্চয়, মূলধন গঠন, আর্থিক অন্তর্ভুক্তির মাধ্যমে উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে গ্রহণ করেছে। এই প্রকল্পটির লক্ষ্য সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের সমান পরিমাণ টাকা মঞ্জুরি হিসেবে প্রদান করে গ্রামীণ অঞ্চলে সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলা, যা প্রচলিত ক্ষুদ্র ঋণ পদ্ধতির বিপরীত। গ্রাম উন্নয়ন সংস্থা (ভিডিও) মাধ্যমে সদস্যদেরকে উদ্যোক্তা হিসেবে তৈরির লক্ষ্যে গ্রামীণ দরিদ্র, অতি দরিদ্র এবং ভিক্ষুকদেরকে ঋণ প্রদান করা হয়। প্রকল্পটি জুন ২০১৮ পর্যন্ত ১৫৫৩১ গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে দেশের সব জেলায় কাজ করে। প্রকল্পটির মোট তালিকাভুক্ত সুবিধাভোগীর সংখ্যা ৩.৬১ মিলিয়ন পরিবার, যা ৬ মিলিয়ন (৩০ কোটি হতদরিদ্র) করার লক্ষ্যমাত্রা রয়েছে। প্রকল্পটি দরিদ্র পরিবারের আয় এবং স্বচ্ছলতা বাড়িয়েছে। অনুমিত ধারণ এমন যে প্রকল্প এলাকায় স্বল্প আয়ের পরিবারের সংখ্যা ১৫ শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে ৩ শতাংশ হয়েছে। প্রকল্পের সমাপ্তির পর এর প্রভাব টেকসই করার জন্য, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক নামক একটি নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এ জাতীয় ব্যাংকের ধারণা বিশ্বের প্রথম যা কিনা দরিদ্রদের জন্য শতভাগ অনলাইন ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে।

দারিদ্র্য হ্রাসের কারণসমূহ:

১) ধারাবাহিক স্থিতিশীল উচ্চ প্রবৃদ্ধি

২) শ্রমের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধি

৩) মানব সম্পদ উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি

৪) স্বল্প আয়ের কৃষি শ্রম থেকে অকৃষিজ কর্মে স্থানান্তরিত হওয়া

৫) ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের প্রবৃদ্ধি বিশেষত তৈরি পোশাক শিল্পের ক্ষেত্রে

৬) রেমিটেন্সের ক্রমবর্ধমান প্রবাহ

৭) পরিবারের নির্ভরশীল সদস্যের সংখ্যা হ্রাস

৮) সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচির আওতা বৃদ্ধি

দারিদ্র্য হ্রাসের জন্য এখনো আমাদের চ্যালেঞ্জ

১) জনমিতিক লভ্যাংশের সুবিধা অর্জন করা

২) কৃষি উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি

৩) কর্মসংস্থান সৃষ্টি সহায়ক প্রবৃদ্ধি

৪) জলবায়ু বিরূপ প্রভাব হ্রাস

৫) প্রতিযোগিতা, ব্যবসায়ে বিনিয়োগের পরিবেশ এবং ease of doing business এ উন্নতি

৬) বাজারের চাহিদা মোতাবেক দক্ষতা সম্পন্ন কর্মী সরবরাহ করা

৭) বেকারত্ব (১.৩ কোটি যুবক শিক্ষা, কর্মসংস্থান এবং প্রশিক্ষণে নেই)

৮) শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান এবং অর্থনৈতিক সুশাসন

৯) সামাজিক নিরাপত্তার জন্য সম্পদ বৃদ্ধি

এসডিজি বাস্তবায়নের উন্নয়ন সহযোগিদের ভূমিকা:

বাংলাদেশ এবং উন্নয়ন সহযোগিদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ ও গতিশীল অংশীদারিত্ব বর্তমান সময়ের চেয়ে পূর্বে কখনও এতটা চাপে ছিল না, বিশেষত এসডিজি বাস্তবায়ন এবং আসন্ন এলডিসি থেকে উত্তরণ প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনার প্রেক্ষাপটে। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলো লক্ষণীয়:

এসডিজি বাস্তবায়নের অংশীদারিত্বের দায়বদ্ধতা : এসডিজি এবং সংশ্লিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশগুলিকে সমস্ত সম্ভাব্য উপায়ে সহায়তা করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়, বিশেষত উন্নয়ন সহযোগিদের তাদের অংশীদারিত্বের দায়বদ্ধতার

স্বীকৃতি এবং তা গ্রহণ করা গুরুত্বপূর্ণ। অগ্রগতির ভিত্তিতে উন্নয়ন সহযোগিদের এসডিজি বাস্তবায়নে প্রচেষ্টা আরও জোরদার করা দরকার।

অভ্যন্তরীন সম্পদ আহরণ করা: যদিও উন্নয়নশীল দেশগুলির সম্পদ আহরণের প্রাথমিক বোঝা দেশগুলোর অভ্যন্তরীন উৎসের উপর নির্ভর করে, তথাপি এখন পর্যন্ত এ সংক্রান্ত তথ্যাদি/প্রমাণক উৎসাহজনক নয়। উন্নয়ন সহযোগিদের উন্নয়নশীল দেশগুলিতে, বিশেষত এলডিসিভুক্ত দেশগুলোতে কর ব্যবস্থার উন্নতি এবং পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীন সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য সহায়ক অবকাঠামো ও কর আহরণ পদ্ধতির উন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে সক্ষমতা বাড়ানোর জন্য প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য সহায়তা প্রসারিত করা দরকার। সক্ষমতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে ওডিএ এই উদ্দেশ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হতে পারে।

ব্যবস্থাপনার জন্য সক্ষমতা বাড়ানো: এটি এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে সম্ভবত উন্নয়নশীল দেশগুলোর উন্নয়ন সহযোগিদের থেকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন। সক্ষমতা বৃদ্ধির আওতায় একাধিক ক্ষেত্র অর্ন্তভুক্ত হতে পারে, যা প্রকল্প ব্যবস্থাপনা থেকে শুরু করে আর্থিক ব্যবস্থাপনা, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আইনী ও রেগুলেটরি কাঠামো উন্নয়ন, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, প্রতিযোগিতা বৃদ্ধি, বিতর্কিত সমস্যার সমাধানগুলোর পরিমার্জন, নেগোশিয়েশনের দক্ষতার বিকাশ, যৌথ স্বার্থের ক্ষেত্র বিস্তৃত করা প্রভৃতি। জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল এই ইস্যুটির গুরুত্ব বুঝাতে বলেছেন "বিশেষত স্বল্পোন্নত দেশগুলির সক্ষমতা জোরদার করার বিষয়টি অভ্যন্তরীন সম্পদ আহরণ এবং রাজস্ব ঘাটতি পূরণে উৎসের প্রসারণ, অবৈধ আর্থিক প্রবাহ রোধ ও মোকাবেলা এবং সহজলভ্য অর্থায়নে প্রবেশের পাশাপাশি ব্যবসায়ের ক্ষেত্রেও প্রবেশ করার সাথে সম্পর্কিত"[৩]।

অনাবিষ্কৃত সম্পদের অন্বেষণ: বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য একটি টেকসই এবং প্রত্যাশিত অর্থনীতি বিকাশের জন্য বাংলাদেশের বিশাল সহায়তার প্রয়োজন। এ উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে সুনীল অর্থনীতির অন্বেষণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, অটোমেশন এবং জৈব প্রযুক্তি অপরিমেয় মূল্য যুক্ত করতে পারে।

প্রবৃদ্ধি ত্বরণের জন্য আরও ক্ষেত্র উন্মুক্ত করা: বাংলাদেশ একটি বিশাল প্রবৃদ্ধির চূড়ায় আরোহণের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে এবং আগামী কয়েক দশকে স্থিতিশীল গতিতে এ আরোহণের জন্য আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সহায়ক পরিবেশের প্রয়োজন হবে। দারিদ্র্য বিমোচন উদ্যোগে সহায়তা দান, ছাড় দিয়ে বাজারে প্রবেশাধিকার প্রদান, এফডিআই এবং অনুকূল শর্তে ঋণ , প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং অভিবাসী কর্মীদের ভিসা প্রদান- এসব সহায়ক হতে পারে এবং উন্নয়নশীল এবং উন্নত বিশ্ব উভয় পক্ষই এই প্রক্রিয়াটিতে অবদান রাখতে পারে।

জলবায়ু ব্যবস্থাপনার সহায়তার সম্প্রসারণ: বিশ্বব্যাপি জলবায়ু পরিবর্তনে তেমন কোনও অবদান না রেখেও বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত বিপর্যয়ের শীর্ষে রয়েছে। এর আলোকে, উন্নয়ন সহাযোগিদের টেকসই ভিত্তিতে এই চ্যালেঞ্জগুলি মোকাবেলা করতে প্রশমন ও অভিযোজন সহায়তার মাধ্যমে বাংলাদেশকে অবশ্যই সহায়তা প্রদান করতে হবে।

---

৩ টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অগ্রগতি বিষয়ক জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিবেদন, ০৮ মে, ২০১৮ (জাতিসংঘ, ২০১৮)

অংশ গ : টেকসই উন্নয়নের জন্য টেকসই অর্থায়ন

সমস্ত অংশীজনকে অন্তর্ভূক্ত করে বৈশ্বিক লক্ষ্য এবং অভীষ্টসমূহকে কার্যকরভাবে জাতীয় পরিকল্পনার মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের সর্বোত্তম অনুশীলনের এক অনন্য উদাহরণ স্থাপন করে বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নে শীর্ষস্থানে রয়েছে। নীচে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এসডিজি বাস্তবায়নে চাহিদা নিরূপণ এবং অর্থায়ন কৌশল সম্পর্কিত একটি সংক্ষিপ্তসার প্রদান করা হলো।

এসডিজি অর্থায়ন কৌশলঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট

এসডিজির অভীষ্টসমূহ বাস্তবায়ন ও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের উদ্দেশ্যে একটি সুনির্দিষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করে ব্যয়ের যুক্তিসঙ্গত প্রাক্কলন এবং অর্থায়ন কৌশল নির্ধারণ করা বাংলাদেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ কারণে এসডিজি বাস্তবায়নে ব্যয়/চাহিদা নিরুপণের জন্য লক্ষ্যমাত্রাভিত্তিক বার্ষিক অতিরিক্ত ব্যয় প্রাক্কলন এবং অর্থায়ন ঘাটতি পূরণ করার জন্য অর্থায়ন কৌশল অনুসন্ধান করা হয়েছে। এক্ষেত্রে "এসডিজি অর্থায়ন কৌশলঃ বাংলাদেশ প্রেক্ষাপট" সমীক্ষা প্রতিবেদনটিতে একটি সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে যাতে বাংলাদেশের এসডিজি বাস্তবায়নে অভীষ্টসমূহের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে প্রয়োজনীয় সকল কর্মকান্ড বর্তমান।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, সরকারি খাত এবং বাহ্যিক উৎসগুলো কর্তৃক এসডিজি সম্পর্কিত বর্তমান বিনিয়োগের তুলনায় ২০১৫-২০১৬ সালের স্থির মূল্যে অতিরিক্ত ৯২৮.৪৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার প্রয়োজন হতে পারে। এই অর্থ (২০১৭- ২০৩০) পর্যন্ত সময়কালে এসডিজি বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন হবে যা সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পুঞ্জিভূত জিডিপির ১৯.৭৫ শতাংশ। এই সময়ের জন্য এসডিজি বাস্তবায়নে বার্ষিক গড় ব্যয় হবে ৬৬.৩২ বিলিয়ন ডলার (স্থির মূল্যে)। বার্ষিক গড় ব্যয় মেটাতে দেশজ তহবিলের পরিমাণ প্রায় ৫৭ বিলিয়ন ডলার (সারণী-১)।

সারণি-১: সম্ভাব্য অর্থায়নের সার-সংক্ষেপ (বিলিয়ন মার্কিন ডলার)

	২০১৭-২০২০ অর্থবছর	২০২১-২০২৫ অর্থবছর	২০২৬-২০৩০ অর্থবছর	২০১৭-২০৩০ অর্থবছর
ক) দেশজ উৎস থেকে মোট অর্থায়ন (মোট ঘাটতির ৮৫.১১%)	১০৭.৭২	২৫৭.৪৯	৪৩০.৮৭	৭৯৬.০৯
বিদেশি উৎস থেকে অর্থায়ন (মোট ঘাটতির ১৪.৮৯%)	২২.০৭	৪৩.১৫	৬৭.১৭	১৩২.৩৯
দেশজ এবং বিদেশি উভয় উৎস থেকে মোট অর্থায়ন (ক+খ) (মোট ১০০%)	১২৯.৭৯	৩০০.৬৫	৪৯৮.০৪	৯২৮.৪৮
দেশজ উৎস থেকে গড় বার্ষিক অর্থায়ন	২৬.৯৩	৫১.৫০	৮৬.১৭	৫৬.৮৬
বিদেশি উৎস থেকে গড় বার্ষিক অর্থায়ন :	৫.৫২	৮.৬৩	১৩.৪৩	৯.৪৬
এফডিআই	২.৭৩	৬.৪৫	১০.৭০	৬.৯১
সাহায্য ও অনুদান	২.৭৯	২.১৭	২.৭৪	২.৫৫

উৎস : এসডিজি ফাইনান্সিং স্ট্র্যাটেজি : বাংলাদেশ পারস্পেকটিভ (জিইডি ২০১৭)

অর্থায়নের উৎসসমূহ

এই প্রতিবেদনে ঘাটতি অর্থায়নের পাঁচটি সম্ভাব্য উৎসের প্রস্তাব করা হয়েছেঃ সরকারি অর্থায়ন; বেসরকারি অর্থায়ন; সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব; বিদেশি অর্থায়ন যেমন- সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (এফডিআই), বিদেশি সাহায্য ও অনুদান; এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ (এনজিও)। বিদেশী উৎসের গড় শেয়ার প্রায় ১৫ শতাংশ। ২০১৭-২০৩০ মেয়াদে ঘাটতি অর্থায়নের গড়ে শতকরা ৩৪ ভাগ আসবে সরকারি খাত থেকে, ৪২ ভাগ আসবে বেসরকারি খাত থেকে। পিপিপি থেকে আসবে ৬ ভাগ, ১৫ ভাগ আসবে বিদেশি উৎস থেকে (সরাসরি বিনিয়োগ ১০ ভাগ এবং বৈদেশিক সহায়তা ৫ ভাগ) এবং অবশিষ্ট ৪ ভাগ ঘাটতি অর্থায়ন আসবে এনজিও থেকে। এসডিজি থেকে যা অর্জিত হবে সেসব ফলাফলের বেশিরভাগ জনপণ্য (Public Goods), সে কারণে ঘাটতি অর্থায়নে সরকারকে ভাল অংশই বিনিয়োগ করতে হবে।

অর্থায়নের চ্যালেঞ্জসমূহ

বাংলাদেশে এসডিজির যথাযথ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলি নিয়ে আলোকপাত করা প্রাসঙ্গিক। টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অন্যতম প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো প্রকল্প এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে ব্যাপক উন্নতি সাধন করা। প্রকল্প বাস্তবায়নে বিলম্বের কারণে প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধির পাশাপাশি প্রকল্প থেকে সুফলপ্রাপ্তির পরিমাণও হ্রাস পায়। আগামী ১৩ বছরে কর-প্রচেষ্টা ০৯ শতাংশ পয়েন্ট বৃদ্ধি সহজ হবে না। বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় বৃদ্ধিতে এনবিআরকে সংস্কার, অটোমেশন দক্ষতা উন্নয়ন, নিরীক্ষা প্রভৃতির ভিত্তিতে নতুন উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। জলবায়ু বিষয়ে আমাদের প্রাপ্তি অনেকাংশেই উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে আলোচনার ক্ষেত্রে আমাদের দক্ষতার উপর নির্ভর করে। বাংলাদেশ এক্ষেত্রে শক্তিশালীকরণের জায়গাগুলো চিহ্নিত করেছে। এই শক্তিশালীকরণ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিশ্চিত করা উচিত। সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বলা হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতা হতে দেখা যায় একটি সুসংগত আইনী কাঠামো থাকলে এবং এর পরিচালনায় দক্ষ পেশাদার কর্মী জড়িত থাকলেই কেবল পিপিপি কাঠামো কার্যকর হয়। আইনগত কাঠামোতে-সংশ্লিষ্টতার সুস্পষ্ট নিয়ম, প্রণোদনা কাঠামো, দ্বন্দ্ব অবসান পদ্ধতি প্রভৃতি সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকতে হবে যাতে কাঠামোটি বিশ্বমানের হয়। পিপিপি-তে গতিশীলতা আনতে সরকারকে উল্লিখিত দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে নজর দিতে হবে।

সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের (পিপিপি) বাস্তবায়ন একটি বড় চ্যালেঞ্জ। পিপিপির সম্ভাব্য ক্ষেত্রগুলি হল বিদ্যুৎ উৎপাদন, অবকাঠামো এবং নগরায়ন। ইতিবাচক উন্নয়ন সত্ত্বেও, পিপিপি এখনও বাংলাদেশের অর্থায়নের প্রধান উৎস হিসাবে আত্ম প্রকাশ করতে পারেনি। পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশীপ এর ক্ষেত্রে ধীর অগ্রগতির জন্য মূলত তিনটি বিষয়কে দায়ী করা যেতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে: (ক) সুচিন্তিত আইনী কাঠামোর অনুপস্থিতি; (খ) আন্তর্জাতিকভাবে দক্ষ পেশাদার এবং প্রকল্প পরিচালনার কর্মীদের অভাব; এবং (গ) মন্ত্রণালয়গুলোর পিপিপি সম্পর্কিত সক্ষমতার অভাব।

অভিযাত্রা

UNESCAP (২০১৬) এর প্রতিবেদন অনুসারে, ২০৩০ সালের মধ্যে সামাজিক বিনিয়োগ প্যাকেজ শুরু করতে ভারতে জিডিপির ১০% এবং বাংলাদেশে জিডিপির ২০% ব্যয় হবে । দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির অবকাঠামোগত নির্মাণ ব্যয় মেটাতে বিপুল সম্পদের প্রয়োজন। বৃহত্তর দেশীয় এবং বাহ্যিক সম্পদকে নিম্নলিখিত কৌশলগুলির মাধ্যমে উৎসাহিত করা যেতে পারে: (ক) দেশীয় সম্পদ আহরণ: করের উন্নতি, ট্যাক্স প্রশাসন শক্তিশালীকরণ এবং ট্যাক্স প্রদানে বাধ্যবাধকতা জোরদার করা ইত্যাদি দেশীয় সম্পদকে বাড়িয়ে তুলতে পারে। এছাড়াও ট্যাক্স ফাঁকি রোধে সমস্যাগুলো সনাক্তকরণ এবং সেগুলি বন্ধ করা জরুরি। (খ) টেকসই উন্নয়নের জন্য বেসরকারী বিনিয়োগ এবং সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্বের সদ্ব্যবহার: পিপিপি গ্রামীণ অবকাঠামোগত চাহিদার ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করে যথেষ্ট সাফল্য দেখিয়েছে। দেশগুলি সরকারি সম্পদ বৃদ্ধির জন্য কর্পোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতায় অবদান রাখতে বেসরকারি খাতকেও উদ্দীপিত করেছে। (গ) টেকসই অর্থায়নের জন্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা: দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক সহযোগিতার সম্ভাবনা অপরিসীম। উন্নত পুঁজি বাজারের তুলনায় অপেক্ষাকৃত স্বল্পোন্নত পুঁজি বাজারগুলোর সম্পদের অর্থায়নের চাহিদা পূরণ করতে এ ব্যবস্থা কাজে লাগানো যেতে পারে। সার্ক উন্নয়ন তহবিল, দক্ষিণ এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং নিউ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক সকলেই মূলধন বাড়াতে অবদান রাখতে পারে।

২০১৬ থেকে সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ কর্তৃক এসডিজি সংক্রান্ত প্রকাশনা

1. Integration of Sustainable Development Goals into the 7th Five Year Plan (February 2016)
2. A Handbook on Mapping of Ministries by Targets in the Implementation of SDGs aligning with 7th Five Year Plan (2016-20) (September 2016)
3. Data Gap Analysis for Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (January 2017)
4. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, লক্ষ্যমাত্রা ও সূচকসমূহ (মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুদিত) (প্রকাশকাল : এপ্রিল ২০১৭)
5. Bangladesh Voluntary National Review (VNR) 2017: Eradicating poverty and promoting prosperity in a changing world (June 2017)
6. SDGs Financing Strategy: Bangladesh Perspective (June 2017)
7. A Training Handbook on Implementation of the 7th Five Year Plan (June 2017)
8. Bangladesh Development Journey with SDGs [Prepared for Bangladesh Delegation to 72nd UNGA Session 2017] (September 2017)
9. Monitoring and Evaluation Framework of Sustainable Development Goals (SDGs): Bangladesh Perspective (March 2018)
10. National Action Plan of Ministries/Divisions by Targets for the Implementation of SDGs (June 2018)
11. Journey with SDGs Bangladesh is Marching Forward [Prepared for Bangladesh Delegation to 73rd UNGA Session 2018] (September 2018)
12. এসডিজি অভিযাত্রা: এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ (জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৩তম অধিবেশনের জন্য প্রণীত) (সেপ্টেম্বর ২০১৮)
13. Synthesis Report on First National Conference on SDGs Implementation (November 2018)
14. Sustainable Development Goals: Bangladesh First Progress Report 2018 (December 2018)
15. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্টঃ বাংলাদেশ অগ্রগতি প্রতিবেদন ২০১৮ (ইংরেজি থেকে অনুদিত) (এপ্রিল ২০১৯)
16. Empowering People: Ensuring Inclusiveness and Equality [For Bangladesh Delegation to High-Level Political Forum 2019] (July 2019)
17. Prospects and Opportunities of International Cooperation in Attaining SDG targets in Bangladesh (September 2019)
18. Bangladesh Moving Ahead with SDGs [Prepared for Bangladesh Delegation to 74th UNGA Session 2019] (September 2019)
19. টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৭৪তম অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিগণের জন্য প্রণীত (ইংরেজি থেকে অনুদিত) (সেপ্টেম্বর ২০১৯)

সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (জিইডি)

বাংলাদেশ সরকারের দারিদ্র্য ও এসডিজি বিষয়ক ফোকাল পয়েন্ট

বাংলাদেশ পরিকল্পনা কমিশন